পান্থনিবাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ

রথযাত্রা

১৩৪২

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সুহৃদ্বরেষু—

এই লেখকের

আকাশ ও মৃত্তিকা

বসন্ত-রজনী

দেহযমুনা

মধুচক্র

বন্ধনী

শৃঙ্খল

কৃষ্ণা

পান্থনিবাস

১

তেরো নম্বর মেস।

ওই বলিলেই ও-পাড়ার যে-কোনো লোক আঙুল দিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাকে মেসটা দেখাইয়া দিবে। রাস্তার নাম বলিবার দরকার নাই। পাড়ায় আরও দু'টা মেস আছে বটে, কিন্তু সেগুলি নূতন হইয়াছে। এটি বহু-কালের,—আদি ও কালে এই মেসটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কালে সমস্ত কলিকাতা সহরেই মেসের সংখ্যা আঙুলে গো

এই মেসের প্রথম অধিবাসীদের কেহই বো জীবিত নাই। থাকিবার কথাও নয়। তার আসিয়াছে, কত লোক গিয়াছে; কিন্তু অতি জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আজও দাঁড়াইয়া আ নম্বর মেস।

আর আছেন দাদু। নাম নরহরি তালুকদা অনেকেই জানে না। সবাই বলে দাদু,—...

হইতে বাবুরা পর্য্যন্ত। পঁয়ত্রিশ বৎসর এই একটা মেসের একই ঘরে তিনি কাটাইতেছেন। বয়স হইয়াছে বলিয়া মধ্যে কিছুদিন মেস ছাড়িয়া দিয়া পল্লীগৃহে জীবনের শেষ কয়টা দিন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইবার ইচ্ছায় গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু থাকিতে পারেন নাই। দুইটি মাস যাইতে না যাইতে আবার তাঁহার বাক্স-বিছানা লইয়া উপস্থিত হন। আর যান নাই।

ভদ্রলোক একটা দেশী ঔষধের দোকানে চাকরী করেন। কি করিয়া করেন ভগবান জানেন। বোধ হয় অভ্যাসের গুণে। নহিলে সকালে আটটা হইতে এগারোটা এবং বিকালে দু'টা হইতে আটটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিবার শক্তি তাঁহার বয়সে সাধারণ বাঙালীর থাকে না। অথচ নিতান্তই যে পেটের দায়ে বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে তাহাও নয়। স্ত্রী বহু কাল পূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ছেলেপুলে নাই। দেশে যেটুকু জমি জায়গা আছে তাহাতে তাঁহার বাকী জীবন নিশ্চিন্ত ভাবেই চলিতে পারে। কিন্তু অবসর গ্রহণের কোনো সঙ্কল্প তাঁহার মনে আছে বলিয়া মনে হয় না।

মেসের ছেলেরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রশ্নও করে :

—আর কেন দাদু ? বুড়ো বয়সে মেসের ডাঁটা-চচ্চড়ি আর ভাত ! ভালোও লাগে ?

দাদু প্রায়ই উত্তর দেন না। বিরলকেশ শীর্ণ মাথাটি সুমুখের দিকে ঝুঁকাইয়া শুধু বলেন,—হুঁ। এইবার যাব।

কেবল যেদিন মনটা ভালো থাকে না, সেদিন বিরক্ত ভাবে

—যাব কি হে! আমার ভাইপো-দু'টি সাং
গু আরম্ভ করেছেন, তাতে আর যেতে ভরস
ধান, তাই নিয়ে দুই ভাইয়ে দিনরাত্তির কুরু
তিষ্ঠনো দায়!

হয় তো তাই। চাকুরীজীবী শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধের ভালো না লাগিবারই কথা। কিন্তু ছেলের দল (চায় না। তাহাদের কেহ বা চাকুরী করে, কেহ বা ... ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা চাকুরী করে তাহাদেরও আয় এত সামান্য যে বাসা করা চলে না। বৃদ্ধের এ কৈফিয়ৎ তাহারা মানিবে কেন? স্ত্রী ছাড়িয়া যাহারা বিদেশে চাকুরী করিতে আসে তাহাদের কাছে দেশের কুঁড়ে ঘরখানির মতো আর কিছুই ন ..

ইহারা তেতালার কয়খানি ঘর জুড়িয়া হাসিতে গানে গল্পে সরগরম করিয়া থাকে। দোতালায় থাকে কয়েকজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। ইহাদের তালায় সাড়া-শব্দ কম। আর একতালায় একখানি ছোট ঘরে থাকেন দাদু,—তামাক খান আর দাবা খেলেন।

এই মেস। কয়টী প্রবাসী প্রাণী সমস্ত দিন অন্নসংস্থানের চেষ্টায় হুড়াহুড়ি করিয়া বেড়ায়; আর রাত্রে ক্লান্ত মনে, শ্রান্ত দেহে এখানে আসিয়া রাত্রিযাপন করে। ইহারা হাসে, চীৎকার করে, গানও গায়। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে যাহারা ক্ষত-বিক্ষত, তাহাদের জীবনে এমন অসম্ভব যে কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা মানব-মনের অগোচর। তবু তাই হয়।

পান্থনিবাস

সেদিন রবিবার। বেলা সাড়ে আটটার বেশী নয়।

কিন্তু গ্রীষ্মকালের বেলা, ইহারই মধ্যে রোদ চন্‌চন্‌ করিতেছে। ভাগ্য ভালো বলিতে হইবে, এই মেসটি এমন চমৎকারভাবে তৈরি করা হইয়াছে যে, বাহির হইতে কোনো দিক দিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এমন কি ভিতর হইতে বুঝিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই যে, বাহিরের মাটি তাতিয়া আগুন হইয়াছে, কিম্বা বেলা কত।

নীচে কলতলায় জন চারেক যুবক গামছা পরিয়া মহাসমারোহে কাপড়ে সাবান দিতেছে, আর তাহারই তালে-তালে গানের নামে বিকট চীৎকার করিতেছে। সপ্তাহে এই একটি দিন ছুটি। কাপড়-জামা পরিষ্কার করিবার সুযোগ অন্য দিন মেলে না।

পাশে দাঁড়াইয়া আরও কয়েকজন বাবু তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাড়া দিতেছে। ডান হাতে সাবান ও বাঁ হাতে কতকগুলো কাপড়-চোপড় লইয়া তাহারা অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। ঊর্দ্ধোত্থিত বাম হাতটি ব্যথা করিতেছে, তবু চলিয়া যাইতে পারিতেছে না, পাছে অপর কেহ জায়গা দখল করিয়া লয়।

দোতালার বারান্দায় অবিনাশবাবু ও মুখুয্যে দুই প্রবীণ ব্যক্তিতে মিলিয়া মেসের শুভাশুভ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতেছেন। আর মাঝে-মাঝে নীচে চাহিয়া ছেলেদের কাণ্ড পরীক্ষণ করিতেছেন। অবিনাশবাবু কি একটা মার্চ্চেণ্ট অফিসের বড় বাবু। লম্বা-চওড়া, নাদুস-নুদুস চেহারা। গোঁফে পাক

রু করিয়াছে। দরাজ গলা, আস্তে আস্তে কথা

াশবাবু উপর হইতে হাঁকিলেন—ওহে, একটু জল রেখো। াদের কাপড় কাচলেই তো হবে না। আমাদেরও নাইতে হবে।

ও-দলের কাপড় কাচা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। গানও মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। তবু তাহাদের সাড়া দিবার সময় নাই। কেবল শীর্ণদেহ উমেশ,—বেচারার সঙ্গীতস্পৃহা কম—মিহি কণ্ঠে সাড়া দিল,—আজ্ঞে, তা থাকবে।

আশ্বস্ত হইয়া অবিনাশবাবু আব রা মখুে র সাহত গল্পে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময় একটি বাইশ-তেইশ ৎসার র ছেলে আসিয়া নমস্কারান্তে প্রশ্ন করিল,—দেখুন, আপনা আছে ?

মুখুয্যে এবং অবিনাশ দু'জনেই তাহার দেখিলেন।

চাহিয়া দেখিবার মতো চেহারা ব নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে দেহ, দেখিলেই মনে হয় ও চোখে বুদ্ধির ছাপ জ্বলজ্বল করিতেছে।

অবিনাশবাবু বলিতে যাইতেছিলেন, হঁ মুখুয্যে অত্যন্ত সাবধানী লোক। তাঁহ থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কো

ছেলেটি সবিনয়ে জানাইল,—এইখান থেকেই। থাকতাম ছেষট্টি নম্বর মেসে। কিন্তু আসছে মাস থেকে উঠে যাচ্ছে। শুনলাম এখানে সীট্ আছে। তাই এলাম একবার খবর নিতে। এই দিকে থাকলেই আমার সুবিধা হয় কি না।

—আপনার দেশ কোথায় ?

—নদীয়া জেলায়।

মুখুয্যে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করা হয় ?

—আজ্ঞে, করা বিশেষ কিছুই হয় না। গোটা দুই ট্যুইশান আছে। সকালে-সন্ধ্যেয় তাই করি। আর দুপুরে চাকরীর চেষ্টায় একটু ঘোরাঘুরি করি।

মুখুয্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—যা দিন কাল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। দেখি কি হয়।

অবিনাশ কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কতদূর পড়া হয়েছিল ?

—আজ্ঞে, বি-এ পাশ করে আর পড়্‌বার সুবিধা হ'ল না। স্কলারশিপের টাকাতেই পড়াটা হচ্ছিল কি না।

মুখুয্যে এবং অবিনাশ দু'জনেই সমস্বরে এবং সবিস্ময়ে বলিলেন, —হুঁ ?

ছেলেটি বলিতে লাগিল,—কিন্তু নিজের পড়ার খরচ আরও দু'টো বছর চালিয়ে নেওয়া হয় তো কষ্টকর হ'ত না। কিন্তু বাড়ীতে কিছু সাহায্য না করলে আর চলছে না। তারা বড় কষ্টে আছে। ছোট ছোট অনেকগুলি ভাই। তাদের পড়াশুনো আছে।

বোনটিরও বিয়ের বয়স ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তাই ভেবে-চিন্তে দেখলাম...

ছেলেটির বিদ্যা-বুদ্ধির কথা শুনিয়া মুখুয্যের মন নরম হইয়া গেল। মিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—এত কথা জিগ্যেস করলাম ব'লে মনে কিছু করবেন না। দেখছেন তো দিনকাল। কি বল হে অবিনাশবাবু! এখন আর সীট্ চাই বললেই সীট্ দেওয়ার উপায় নেই। একটু খবরাখবর নিতে হয়। না কি বল অবিনাশ!

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, এবং কহিলেন,—মুখুয্যে, তোমার ঘরের সীট্টাই তো দিতে পার। ওটা তো খালিই আছে।

মুখুয্যের মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া ঘরে দু'খানি সীট্। একটি তিনি দখ একটি খালি। ফলে সমস্ত ঘরটিই একা অথচ ভাড়া দিতে হয় একটি সীটেরই। সে সুবিধা নয়।

তিনি বলিলেন,—না, না, ছেলে মানুষ। পাঠাও। এখানে ওঁরই সুবিধে হবে না।

—তেতালার সীট্ কই ?

তাও বটে। এ ব্যাপারে মুখুয্যের অ উপায় রহিল না। মেসে সীট্ খালি থ সীটের ভাড়া সকল বাবুদের ভাগ করিয়া [illegible]

আসিলেও তাহাকে সীট দেওয়া হয় নাই এ খবরটা বাবুদের কর্ণগোচর হইলে তাহারা মুখুয্যেকে ছিঁড়িয়া খাইবে। অথচ সমস্ত ঘরটি একলা লইয়া ব্যয়-বাহুল্য করিবার পাত্রও মুখুয্যে নন।

তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে হইল,—তবে তাই হোক।

ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—এ মেসে খরচ কত পড়ে?

মুখুয্যে বিরক্তভাবে বলিলেন,—তা কি ঠিক আছে মশাই? এ তো আর বোর্ডিং নয়। মেসে থেকেছেন বলছেন, অথচ এটা জানেন না?

এ উত্তরের পরেও ছেলেটি সবিনয়েই বলিল,—তবু? আন্দাজ?

—আন্দাজ পনেরোর কম নয়, কুড়ির বেশী নয়।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—না, না, মুখুয্যে, কুড়ি পড়ে না। পনেরো, বড় জোর ষোলো। আমরাও তো ছাপোষা-মানুষ।

অবিনাশ গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন।

মুখুয্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—না, না, অবিনাশ। এ আইনের কথা। পড়ুক যাই কিছু, মোট কথা কিছু ঠিক নেই। কুড়ি পড়লেও 'না' বলতে পারবেন না।

ছেলেটি একটু বিব্রতভাবে বলিল,—কুড়ি!

মুখুয্যে তেমনি ভাবে বলিলেন,—তা পড়তে পারে।

অবিনাশ ছেলেটির কাছে আসিয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—না-না, আজকালকার সস্তার বাজারে ষোলোর বেশী কখনও পড়ে না। আপনার কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। তাছাড়া আপনি ভালো ছেলে, এর মধ্যে চাকরী একটা হবেই। কেন ভয় পাচ্ছেন?

ছেলেটি নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—আচ্ছা, তা হ'লে তাই হবে। পরশু পয়লা, আমি সকালেই আসব।

অবিনাশ তাহাকে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—তাই আসবেন।

বলিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মুখুয্যের পাশে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মুখুয্যে হঠাৎ রেলিঙের বাহিরে গলা বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া বলিলেন,—শুনছেন? ও মশাই!

ছেলেটি তখন একতালায়। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমাকে ডাকছেন?

মুখুয্যে বলিল,—আজ্ঞে হাঁ। তাহ'লে পরশু আসছেন ঠিক তো?

—তাই তো ব'লে গেলাম।

—তাহ'লে কালকে কিছু অগ্রিম দিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে অগ্রিম দিয়ে যায় তাহ'লে কিন্তু সীট্ হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। বুঝলেন না?

ছেলেটি এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তার পরে বলিল, —আচ্ছা, তাই হবে।

—আর শুনুন।

ছেলেটি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—আপনার নামটি ?

—শ্রীতপনকুমার অধিকারী।

২

মঙ্গলবার সকালেই তপন তাহার অতি সামান্য আসবাবপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। একটা বিছানা, একটা ষ্টীলের বাক্স, আর একখানা আমকাঠের চৌকি।

মুখুয্যে চৌকি দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, ছারপোকা আছে তো?

তপন মাথা চুলকাইয়া বলিল,—তা···

—বুঝতে পেরেছি। ওটা বাইরেই রাখুন। একটু পরে চাকর দিয়ে ছাদে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন?

তথাস্তু। তপন সেখানাকে বাহিরেই রাখিয়া দিল। তার পরে মুস্কিল বাধিল ঘর লইয়া। এ ঘরে আর কেহ আসিবে না সিদ্ধান্ত করিয়া মুখুয্যে নির্ভাবনায় সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া আসবাবপত্র সাজাইয়া বসিয়া ছিলেন। এখন সেগুলি সরাইতে হইবে। সরানো অবশ্য যায়, কিন্তু ঘরে আর জায়গা নাই। মুখুয্যের বিছানাপত্র আছে, গোটা দুই বাক্স আছে। গোটা দুই শেল্‌ফ্‌ আছে, তাহাতে দাঁতের মাজন, মাখিবার তেল, জুতার কালি ও বুরুষ এবং আরও বিবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। আর আছে দেওয়াল জুড়িয়া হরেক রকমের সচিত্র দেওয়ালপঞ্জী। কিন্তু সেগুলাকে লইয়া অসুবিধা নাই। সম্প্রতি নিলামে মুখুয্যে একটা টিপয় আর একটা র‍্যাক কিনিয়াছেন। সে দু'টিকে বাহিরে রাখিতে সাহস

হয় না অথচ বুকে করিয়া না শুইলেও তপনের শোয়ার স্থান হয় না।

তপন ঘরখানির চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে জোড়া দুই জুতা বাদুড়ের মতো ঝুলিতেছে। এক কোণে মস্ত বড় একটা টবের প্যাকিং কেসের মধ্যে মুখুয্যের তামাক, টিকা, হুঁকা ও কলিকা সযত্নে রক্ষিত। মাথার উপর কড়িকাঠে একটা লেপই বোধ করি মেঝের সহিত সমান্তরালভাবে ঝুলিতেছে।

মুখুয্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মাথা চুল্‌কাইলেন। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, ও এখন ওই রকমই থাক। ফিরে এসে সব ঠিক হবে এখন। রবিবারে তো পালেন না! আজকে এখন আফিসের তাড়া। কোথায় কি করি বলুন তো?

কিছুই করা গেল না। মুখুয্যে যথাসময়ে আফিস চলিয়া গেলেন। আর তপনও আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আফিস-অঞ্চলে দৈনন্দিন টহল দিতে বাহির হইল। ফিরিল পাঁচটার পর।

মুখুয্যে ঘরের তালার দ্বিতীয় চাবিটি দিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই সাহায্যে দ্বার খুলিয়া তপন মেঝের উপরই পা ছড়াইয়া বসিল। একটু পরেই তাহার নজরে পড়িল ওদিকের বারান্দা ঘুরিয়া একটি অতি শীর্ণ, দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক তাহারই ঘরের সুমুখ দিয়া আসিতেছে। এক একটা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া দেখা যায়

প্রকাণ্ড বড় চেহারা, দেখিলে মনে হয় ওয়েলারের সগোত্রীয়। কিন্তু
হাড়গোড় বাহির করা এবং চলেও ঢিমা তালে।
তেমনি। রৌদ্রে পুড়িয়া মুখ কালো হইয়া গিয়াে
দিকে, পা যে কোথায় পড়িতে কোথায় পড়িতে
নাই। আপনার মনে শিশির ভাদুড়ির অনুকর
আসিতেছে :

"প্রজানুরঞ্জন! প্রজানুরঞ্জন!
প্রজানুরঞ্জন তরে জানকীরে দিছি
বিসর্জ্জন…"

তপন সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল। এতক্ষণে ভদ্রলোকের দৃষ্টি খলোক হইতে ভূলোকে ফিরিয়া আসিল। একবার তাহার পানে অপাঙ্গে চাহিয়াই স্বর নামাইয়া ফেলিল।

—এই যে, কতক্ষণ এলেন?

—সকালেই।

—সকালেই? বেশ, বেশ।

ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়া তেতালায় চলিয়া গেল। তপন ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিল,—প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন…

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইতে তপনের বেশীক্ষণ লাগিল-না। বিকালে ছাদের উপর দু'জনে বেশ গল্প জমিয়া গেল।

ভদ্রলোক ঠিক নয়। দেখিলে মনে হয় বয়স ত্রিশের ও-ধারে।

কিন্তু সে কতকটা তাহার দীর্ঘ দেহের জন্য, কতকটা শীর্ণ মুখের উপর পরিপুষ্ট গোঁফের জন্য। আসলে সে তপনেরই সমবয়সী, কিম্বা দুই এক বৎসরের বড়। নামটি বিলাস, কিন্তু দেহের কোথাও বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। হয় তো মনের মধ্যে আছে, এবং শিশির-বাবুর অনুকরণে বক্তৃতা ও বাদল গোস্বামীর ঢঙে গান হয় তো তাহারই প্রকাশ।

তপন বলিল,—বেশ আছেন মশাই! চাকরী বাকরী করছেন, বাড়ীতে টাকা পাঠাচ্ছেন, আর মেসে ফূর্ত্তি ওড়াচ্ছেন। বেশ আছেন।

বিলাস বেশ থাকার কথা অস্বীকার করিল না। কেবল বাড়ীতে টাকা পাঠাইবার কথায় আপত্তি করিল।

কহিল,—বাড়ী? নাহি মোর গৃহ।

সংবাদটা শুনিয়া তপন দুঃখিত হইল। বেচারীর হয় তো কেহই নাই। মেসেই বারো মাস পড়িয়া থাকে।

সহানুভূতির স্বরে কহিল,—আপনার কি কেউ নেই? আত্মীয়-স্বজন?

বিলাস প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর দুইটি অঙ্গুলি আন্দোলিত করিয়া কহিল,—

তা নয়, তা নয়, বন্ধু,
আছে জ্যেষ্ঠ পঞ্চজন,
সবার কনিষ্ঠ আমি।
গৃহ তাহাদের। মোর গৃহ নাই।

তপন হাসিয়া বলিল,—অর্থাৎ আপনি বিয়ে করেন নি। এই না?

বিলাস আবার বক্তৃতা করিয়া বলিল,—

ঠিক তাই। নহি গৃহী, নহিক সন্ন্যা:
চাকরী থাকে না যবে, দাদারা পাঠান
আমি মেসে বসি করি তার সদসদ্ ব্যবহার।
আমার শ্রমের অর্থ চান না তাঁহারা।

দেখছেন? কি রকম শক্তি? মুখে-মুখে আমি অনর্গল অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা করে যেতে পারি। পারেন আপনি? বিয়ে তো পাশ করেছেন অনার্স নিয়ে। আর আমার বিদ্যে জানেন? ম্যাট্রিকুলেশন।

তপন সবিস্ময়ে একবার বিলাসের মুখের দিকে চাহিল। লোকটি পাগল নয় তো? কিন্তু বিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া সে আশ্বস্ত হইল। চশমার অন্তরালে লোকটির বড় বড় দু'টি চোখ কৌতুকভরে নাচিতেছে। পাগল নয়। অমনি থিয়েটারী ঢঙে কথা বলাই তাহার আনন্দ।

বিলাস জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু এসে পর্য্যন্ত দেখছি আপনি দিন-রাত্রি মুখ শুকিয়ে থাকেন। ব্যাপার কি, বলুন তো? সম্প্রতি বিয়ে-থা করেছেন নাকি?

তপন তাড়াতাড়ি বলিল,—নাঃ মশাই, বিয়ে করব কি?

—তবে আর কি? একটা গান ধরুন, আমি এই ভাঙা তক্তাপোষটা বাজিয়ে তাল দি। ধরুন!

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—গান ধরব কি মশাই ?

— কেন, দোষটা কি ?

—না, দোষ কিছুই নয়। আসলে গান আমার আসে না।

বিলাস তক্তাপোষে দু'টা চাঁটি দিয়া বলিল,—ও, আসে না। তাহ'লে আর কি করবেন ? দেখুন, আমি যদি বাদল গোঁসায়ের মতো গলা পেতাম, তাহ'লে don't care···don't care! বুঝলেন ?

বলিয়া তপনের একেবারে নাকের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা উঁচু করিয়া ধরিল।

এই ছেলেটিকে তপন যতই দেখিতেছিল ততই মুগ্ধ হইতেছিল। ইহার উদার মন কেবলই আপনাকে সুমুখের দিকে প্রসারিত করিয়াই চলে, কোথাও সূক্ষ্ম প্যাঁচ মারে না। দশটা-পাঁচটা আফিস করে। সে কাজে খাটুনিও যথেষ্ট। কত যথেষ্ট তাহা সে আজ বিকালে তাহার পরিশ্রান্ত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়াই বুঝিয়াছে। কিন্তু কিছুই যেন অধিকক্ষণ ইহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিতে পারে না।

এই কথাই তপন ভাবিতেছিল। হঠাৎ বিলাস চীৎকার করিয়া উঠিল,—আরে, এই যে ভুবন-দা' আসুন আসুন।

তপন ভুবনদার স্থান সঙ্কুলানের জন্য একটু সরিয়া বসিল। কিন্তু ভুবনদা তক্তাপোষে বসিলেন না; নীচেই উবু হইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়া এক-সঙ্গেই প্রসন্ন হাসি ও তামাকের ধোঁয়া নির্গত হইতে লাগিল।

পান্থনিবাস

ভুবনদার বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। মাথার চুলেও পাক ধরিয়াছে,—গোঁফেও। পাক ধরে নাই শুধু মুখে। তাহাতে মা-মরা দুষ্টু ছেলের মতো একটু সলজ্জ হাসি লাগিয়াই আছে। কাছেই কি একটা দোকানে কাজ করেন। কিন্তু সেখানে তামাক খাইবার সুবিধা নাই বলিয়া একটু ফাঁক পাইলেই মেসে আসিয়া তামাক খাইয়া যান।

নিজের বয়স সম্বন্ধে তিনি কদাচিৎ সচেতন থাকেন। সেজন্য মেসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গেই তাঁহার ব্যবহার একই রূপ। বিশেষ, সম্প্রতি দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করার পর হইতে তিনি প্রবীণ অপেক্ষা নবীনের দলেই মিশিতেছেন বেশী।

বিলাস হঠাৎ গলা নামাইয়া বলিল,—আপনার একখানা চিঠি এসেছে ভুবনদা। পেয়েছেন?

ভুবনদার গোঁফের ফাঁকে আবার একটুখানি সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুখের মধ্যে খানিকটা হুঁকার জল গিয়াছিল। সেটুকু পিচ্ করিয়া পেছনের দিকে ফেলিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—পেয়েছি।

—খবর সব ভালো?

চিন্তিত ভাবে ভুবনদা বলিলেন,—না, ভালো খুব নয়

ভাই। তোমার বৌদির পেটের অসুখ করেছে, শালাটি জ্বরে ভুগ্‌ছে। আবার বিপদের ওপর বিপদ শোনো, একটা নতুন কম্‌লি বাছুর হয়েছিল সেটা হঠাৎ ট্রেনে কেটে মারা গেছে। ওদের সময়টা এবার ভালো যাচ্ছে না। বুঝলে?

বলিয়া বুকপকেটে একবার হাত দিয়া দেখিয়া লইলেন, চিঠিখানা ঠিক আছে কি না।

বিলাস সশ্রদ্ধভাবে কহিল,—পকেটেই আছে বুঝি? কই দেখি চিঠিখানা?

এমন চমৎকারভাবে সে চিঠিখানা চাহিল যে ভুবনদার অস্বীকার করিবার কথা মনেই হইল না। তিনি বাঁ হাত দিয়া সেখানা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

বিলাস চিঠিখানা খুলিয়াই দেখিল, ভুবনদা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত করেন নাই। সত্যই একখানি দশলাইনের চিঠিতে কেবল ওই কয়টি অতিপ্রয়োজনীয় সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে তার পরেই 'ইতি'।

বিলাস সবিস্ময়ে কহিল,—ক'রেছেন কি ভুবনদা?

ভুবনদা চমকিয়া হাতের হুঁকা নামাইয়া বলিলেন,—কেন? কি হয়েছে?

—এমনি ক'রে কি বৌকে চিঠি লেখে?

আশ্বস্ত হইয়া ভুবনদা আবার হাতের হুঁকা তুলিয়া লইলেন।

—আমাদের ওই রকমই চিঠি লেখালেখি। তোমাদের মতো নবীন ছোকরা তো নই।

বিলাস নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—আপনিও নিশ্চয় এমনি চিঠি লেখেন, না ভুবনদা?

এবারে ভুবনদা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—আবার কি? বুড়ো বয়সে···হুঁঃ!

বিলাস বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল,—কাজটা কিন্তু ভালো করছেন না, ভুবনদা। এ রাগের চিঠি।

আশঙ্কায় ভুবনদার মুখ ছোট হইয়া গেল। বলিলেন,—কি রকম?

—সেই রকমই। ভুবনদা, আপনার না হয় দ্বিতীয় পক্ষ, ওঁর তো আর তা নয়। ওঁর সাধ আছে, আহ্লাদ আছে, সবই আছে। না, না, এ ঠিক নয়। আপনি কাল সকালেই আমার ঘরে আসবেন। আমি আছি, এই ইনি আছেন। বি-এ পাশ ইনি, জানেন ভুবনদা? তিনজনে মিলে ভেবে-চিন্তে লেখা যাবে এখন।

ভুবনদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন,—পাগল আর কি।

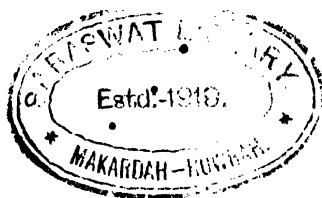
—না, পাগল নয়। তাই করতে হবে। আচ্ছা, ভুবনদা, আপনি কবিতা লিখতে পারেন?

ভুবনদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—কখনও চেষ্টা ক'রে দেখি নি তো।

ভাবটা এই, চেষ্টা করিয়া কোনো দিন দেখেন নাই বটে, কিন্তু করিলে নিশ্চয় লিখিতে পারিতেন।

বিলাস হাসি চাপিয়া কহিল,—চেষ্টা করুন। করতে হবে। আজকাল কবিতায় চিঠি লেখাই রেওয়াজ। কি বলেন তপনবাবু? আপনি তো সব সমাজেই মেশেন?

তপন কোনো কথাই বলিল না। সে ভুবনদাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।



৩

এমনি কয়েকটি প্রাণী তেরো নম্বর মেসে বাসা বাঁধিয়াছে। কলিকাতা শহরে একটি লোকের থাকার খরচ কম নয়। থিয়েটার-বায়োস্কোপ এবং ট্রাম-বাসের খরচ না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া-আসা তো বন্ধ করা যায় না। এ-সব চালাইয়া কেরাণীর বেতনের অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। ফলে দেশে সমস্ত পরিবার অভাবের তাড়নায় অস্থির হইয়া ওঠে, আর এখানেও আফিসের কাজের তাড়ায় ভদ্রলোকের প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে! কোনো দুঃখেরই শেষ দেখা যায় না। এই দুই দিগন্তপ্রসারী মরুভূমির মধ্যে আছে মেস,—তরুলতার পত্র-মর্ম্মরে ও জলের কলকল্লোলে নন্দিত যেন একটি ওয়েসিস।

কিন্তু এও মায়া। কলকল্লোল শোনা যায় বটে, দূর হইতে সে হাসি, সে উল্লাস, সে বিরতিবিহীন সঙ্গীত-লহরী শুনিলে ভালোই লাগে। কিন্তু এ কল্লোলও জীবনের নয়, মৃত্যুর। অতি ছোট লোভ, অত্যন্ত তুচ্ছ স্বার্থ, প্রতি-দিনকার অত্যন্ত লজ্জাকর কলহ গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়া মানুষের মনকে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে।

অবিনাশবাবুর দেশের বাড়ীতে যায় নাই এ মেসে এমন একটি লোকও নাই। চিরটা কাল তিনি মেসে কাটাইতেছেন, বড়বাবু-

গিরিও অনেক দিনের! এই দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ের তিনি অপব্যয় করেন নাই। দেশে জমিজায়গা কিছু করিয়াছেন এবং অল্পদিন হইল একটা পাকা বাড়ীও তুলিয়াছেন। চমৎকার বাড়ী। সেই বাড়ীটি তোলার পর হইতেই মাসে একবার মেসের কাহাকেও না কাহাকেও দেশে বেড়াইতে লইয়া যাইবার উপলক্ষে বাড়ীটি দেখাইয়া আনেন। এই সূত্রে মেসের প্রায় সকলেই একবার না একবার তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া আসিয়াছে। এবং যাহারা গিয়াছে তাহারা তাঁহার আতিথ্য কোনোদিন ভুলিতে পারিবে না।

সে কী আতিথ্য! প্রচুর আয়োজনের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু যত বড় আন্তরিকতা থাকিলে মানুষ সুদূর পাড়াগাঁয়ে এইরূপ প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে, এ পৃথিবীতে তাহা সুলভ নয়। বাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের পদধূলি পড়িয়াছে বলিয়া ভদ্রলোকের সে কী আনন্দ! সমস্ত দিন শুধু ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান। এখান হইতে কমলশহর দশ মাইল দূরে। সেখানকার কইমাছ বিখ্যাত। সকালে একজন লোক সাইকেলে ছুটিল কইমাছ আনিতে। কালীদহ হইতে আসিল কাঁচাগোল্লা এবং আরও যেন কি। বাড়ীতে সমারোহ পড়িয়া গেল।

ইহাই অবিনাশবাবুর সত্য পরিচয়। অথচ সেই অবিনাশ-বাবুকেই যদি আজ সন্ধ্যায় মুখুয্যের ঘরে বসিয়া নিরিবিলি নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা চালাইতে শুনেন, আপনারা কি মনে করিবেন? অথচ ইহাও সত্য।

অবিনাশবাবু বলিতেছিলেন,—এ কাণ্ড রোজই ঘট্‌ছে।

তুচ্ছ একটা মাছের মুড়ো খাচ্ছে, খাক। সেজন্যে বলিনি। কিন্তু রোজ রোজ নিজেরাই বা খায় কি ক'রে? শুধু মাছের মুড়োই নয় মুখুয্যে, তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখো মাছের বড়খানিটি ওরই পাতে। আমি দেখেছি কি না।

মুখুয্যে একটু বিজ্ঞের মতো হাসিয়া বলিলেন,—এ আমি আগেই জানতাম। তোমাকে বলেছি কি না মনে নেই. কিন্তু ম্যানেজারী নেবার আগ্রহটা দেখলে না? ঘরের খেয়ে কেউ কি অমনি বনের মোষ তাড়ায়? হুঁ হুঁ!

অবিনাশ তাঁহার হাঁটুতে একটা চাপড় দিয়া বলিলেন, কিন্তু এ তো চলবে না মুখুয্যে! এ সমস্ত অনাচার বেশী দিন চললে মেস টিকবে না। তোমাকে একটু লাগতে হ'য়েছে। এমন ক'রে হাল ছেড়ে দিলে হবে না।

মুখুয্যে নিঃশব্দে অবিনাশের কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

তারপর বলিলেন,—কি জান? ছেলেরা দেখছে-শুনছে···

বাধা দিয়া অবিনাশ বলিলেন,—ছেলেরা মানে? কতকগুলো চ্যাংড়া। ওরা মেসের জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? ইস্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে কালকে এল মেসে। আর আজকে ওরাই হ'ল কর্ত্তা, আমরা কেউ নই?

মুখুয্যে একটু চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,—মুস্কিল কি জান ভাই, জুটেছে কতকগুলো ফাজিল ছোকরা। একটা কথা বলতে গেলেই, মুখের ওপর জবাব দিয়ে বসবে।

—জবাব দিয়ে বসবে ?

—বসবে কেন, বসেই তো।

—কি রকম ?

—এই ধর না কেন, সেদিন কতকগুলো বালিশের অড়, চাদর-টাদরে সাবান দিয়েছিলাম। সে-গুলো মেলে দিয়েছিলাম। ওঃ সুমুখের তারে। হঠাৎ তোমার সুনীল এসে আমার চোখের সামনে সেগুলো সরিয়ে ফেলে দিলে। যদি বললাম, বাপু, ও-গুলো সরিয়ে দিলে কেন ? একটু কষ্ট ক'রে ছাদে গিয়ে কাপড়খানি মেলে দিয়ে এলেই তো পারতে। তা ছোকরা পট্‌ ক'রে আমার মুখের ওপর জবাব দিলে, আপনারই ছাদে গিয়ে মেলে দিয়ে আসা উচিত ছিল। অতগুলো জিনিস মেলে দিয়ে সমস্ত তারটা দখল করা ঠিক হয় নি।

অবিনাশ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—তুমি বললে না কেন…

—আবার বলব কি ? বুড়ো বয়সে একরত্তি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে তো পারি না। মানে মানে সরে পড়লাম।

অবিনাশ বিরক্তভাবে বলিলেন,—হুঁঃ!

—এই ব্যাপার, অবিনাশ বাবু। তার চেয়ে বরং চল সরে পড়ি কোনো সুবিধামতো জায়গায়। এখানে আমাদের আর পোষাবে না।

—ছেড়ে যাব কি রকম ? বিশ বচ্ছর আছি, ছেড়ে যাব ? তা ছাড়া 'লীজ্‌' যে আমাদের নামে !

—'লীজ্‌' ছেড়ে দোব। ওরা তো লায়েক হ'য়েছে। ক্ষমতা থাকে নিজেরা 'লীজ' নিক।

কথাটা অবিনাশের মনঃপূত হইল না।

বলিলেন,—তার চেয়ে বরং একবার দাতুকে ডাকা যাক্। কি বল? আমাদের মধ্যে তিনিই তো প্রবীণ। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একবার পরামর্শ করা দরকার।

মুখুয্যে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন,—তবেই হয়েছে! তাঁর যদি মনুষ্যত্ব থাকতো তবে আর ভাবনা কি? এখন তিনি হয়তো সুনীলের সঙ্গেই দাবায় বসেছেন। মাথার ওপর বাড়ী ভেঙ্গে পড়লেও টের পাবেন না।

কথাটা মুখুয্যে মিথ্যা বলেন নাই। দাতু তখন দাবাতেই বসিয়াছিলেন এবং ওই সুনীলের সঙ্গেই। সুনীলের বয়স নিতান্তই অল্প, কিন্তু দাবাটা খেলে ভালো। আর দাতুর দাবা একটা নেশা। আগে তাঁহার খেলা দেখিতে লোক জমিত। সে খেলা এখন আর নাই। চোখে ভালো নজর চলে না। সুনীলের কাছেও প্রায়ই তিনি হারেন, তবু সন্ধ্যাবেলায় দাবার ছকটি পাতিয়া সুনীলকে একবার হাঁক দেওয়া চাই-ই।

দাতুকে উঠাইতে অবিনাশবাবুকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। 'যাই' 'যাই' করিতে করিতেই দাতুর আধঘণ্টা দেরী হইল। যখন উঠিলেন তখনও কিন্তু মন পড়িয়া আছে দাবার ছকটির উপর। নিতান্ত না দেখার ভুলে ঘোড়াটি তাঁহার বেঘোরে প্রাণ হারাইল।

অথচ একটু নজর পড়িলেই ঘোড়াটিকে অনায়াসে বাঁচাইতে পারা যাইত। তাঁহার সমস্ত মন পড়িয়াছিল সেইখানে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতেও তিনি তারস্বরে প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পরাজয়টা মোটেই পরাজয় নয়।

সুনীলের উপর ইহার শোধ তুলিবার জন্য দাদুর মন ভিতরে-ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন,—বসুন।

দু'জনের মুখের পানে বিব্রতভাবে চাহিয়া বসিতে বসিতে দাদু বলিলেন,—কি ব্যাপার?

—বসুন, বলছি। তাড়া কি?

ধমক খাইয়া দাদু নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

মুখুয্যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,—দিন দিন মেসের ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে একবার চোখ চেয়ে দেখছেন?

দাদুর দাবার নেশা কাটিয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে একবার ঘরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন,—ঠিক নজরে তো পড়ে নি ভায়া।

—একবার দৃষ্টি দিন। দিনরাত্রি আফিস আর দাবা নিয়ে থাকলে তো চলবে না। এতকালের মেসটা কি শেষটায় ভাঙবে?

মুখুয্যে কথাটা আর ভাঙিয়া বলেন না। উৎকণ্ঠায় দাদুর তালু পর্য্যন্ত তখন শুকাইয়া উঠিয়াছে। কথাটা কি প্রশ্ন করিতে পর্য্যন্ত

ভরসা পাইতেছেন না। তিনি একবার মুখুয্যের দিকে, একবার অবিনাশের দিকে সভয়ে চাহিতে লাগিলেন।

অবিনাশ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। এইবার কথাটা ভাঙিলেন।

কহিলেন,—মেসে তো আর থাকা চলে না দাদু। অনাচার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নতুন ম্যানেজারের কাণ্ডটা দেখছেন তো ?

দাদুর তখন উত্তর দিবার শক্তি নাই। দুইটা কাঠের ঘোড়া এবং একজোড়া কাঠের হস্তী দিয়া শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া আড়াই চালে তিনি শত্রু-পক্ষের রাজাকে কোণঠাসা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অকস্মাৎ এ কী বিপর্য্যয় কাণ্ড !

শুষ্ক মুখে দাদু শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, কোনো অনাচারই এখন পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

—বলি, গেল দু'মাসের মধ্যে মাছের মুড়ো কোনো দিন পাতে পড়েছে ?

কপাল কুঁচকাইয়াও দাদু স্মরণ করিতে পারিলেন না, পড়িয়াছে কি পড়ে নাই।

চরিতার্থতার হাসি হাসিয়া অবিনাশ বলিলেন,—কপাল কোঁচকালে কি হবে ? পড়লে তো মনে পড়বে ? খাবার সময় একটু এদিক-ওদিক লক্ষ্য রাখবেন, তাহ'লেই টের পাবেন কার পাতে রোজ পড়ছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত দাদু অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এখন মনে হইল, পায়ে যেন মাটি ঠেকিতেছে।

মুখুয্যে অবিনাশকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন,—আর সেই কথাটাও বল হে। সেই 'ফিষ্টের' কথাটা।

অবিনাশের কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

কহিল,—হ্যাঁ। পরশু রাত্রে একটু খাবার-দাবার আয়োজন হ'য়েছিল, মনে আছে দাদু? হঠাৎ অত ঘটা কেন বলুন তো?

—জানি না।

—ম্যানেজারের দেশ থেকে 'ফ্রেণ্ড' এসেছিল। বুঝলেন?

—বুঝলাম।

বলিয়া দাদু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কহিলেন,—সবই বুঝলাম ভাই। কেবল এইটুকু বুঝলাম না অবিনাশ, যে তোমার বাড়ীতে মাছের মুড়োর অভাব নেই, বাড়ীতে লোকজন এলে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনেরও ত্রুটি কর না। এ তো নিজেই দেখে এসেছি। তোমার নজর এদিকে পড়ল কি ক'রে?

অবিনাশ ঝাড়িয়া উঠিলেন।

বলিলেন,—দেখুন দাদু, আমার বাড়ীতে যদি পাঁচজনের পায়ের ধূলো পড়ে সে আমি ভাগ্য ব'লে মানি। আপনি চলুন, যতদিন খুসী থাকুন তাতে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু এ তো বাড়ী নয়, মেস। এখানে কেউ কুটুম্বিতা করতে আসি নি। এখানে দেনা-পাওনার ব্যাপার। আমি আমার দেনা ন্যায্যগণ্ডা মিটিয়ে দোব, আর আমার পাওনা ন্যায্যগণ্ডা বুঝে নোব।

—তাই নাও ভাই। কিন্তু আমি বুড়োমানুষ, আমাকে ছাড়ো। আমার ও-দিকে লগ্ন ব'য়ে যায়। খেতে বসবার আগে সুনীল ভায়াকে বাজি দুই দিয়ে দিতে হবে। কিছু মনে ক'রো না।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে দাদু বাহির হইয়া গেলেন।

দুই বন্ধু অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলেন,—অপদার্থ!

দাদু চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারের মীমাংসা অত সহজে হইল না। রবিবারে সন্ধ্যাবেলায় মেসের সভা বসিল। সভা নয়, হট্টগোল। সবাই নিজের নিজের কথা বলে, শুনিবার লোক নাই।

দাদুর আসিবার ইচ্ছা ছিল না। পাঁচজনের টানাটানিতে পড়িয়া একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরে আসিয়া বসেন নাই। বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন দেখিলেন সকলেই চীৎকারে মত্ত, তখন সুবিধা বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন,—একা নয়, সুনীল-ভায়াকে শুদ্ধ লইয়া।

আর আসে নাই বিলাস। আলো নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার গৃহকোণে সে নিঃশব্দে চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল।

বাহিরে তখন কলহ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। মাছের মুড়া,

'ফ্রেণ্ড', কাপড় মেলিবার স্থানাভাব, সে সব কথা তো উঠিলই তা ছাড়া আরও বহু অভিযোগ উঠিল। যাহারা দিনের বেলা বেলা করিয়া খায় তাহাদের অভিযোগ তাহারা উপযুক্ত পরিমা তরকারী পায় না। যাহারা সকালে খায় তাহাদের অভিযো কতকগুলি বাবু বেলা করিয়া খায় বলিয়া ঠাকুর-চাকর সকালে ছু পায় না, ফলে রাত্রের রান্নার বিলম্ব হয়। যাহারা ইতিমধ্যে মেসে টাকা অগ্রিম জমা দিয়াছে তাহারা আস্ফালন করিল যাহারা দে নাই তাহাদের উপর। যাহারা টাকা দেয় নাই তাহারাও আস্ফাল করিয়া জানাইয়া দিল পনেরো তারিখের মধ্যে তাহারা কিছুতে টাকা দিতে পারিবে না। তাহাদের তো এখানে জমিদারী নাই মাহিনা না পাইলে কি করিয়া দিবে? এমনি সহস্র খুঁটিনাটি কথা উঠিল।

মুখুয্যে রাগিয়া বলিলেন, বুড়া বলিয়া ছেলেদের দল তাঁহাদে একেবারে বাতিল করিয়া দিতে চায়।

ছেলেরা জবাব দিল, ছেলেমানুষ বলিয়া বুড়ারা তাহাদে উড়াইয়াই দিতে চান। কেন? টাকা কি তাহারা কম দেয়?

অবিনাশবাবু জবাব দিলেন,—তবে আমার দ্বারা আর 'মেসের 'লীজ' নেওয়া হবে না। তোমরা তো মুরুব্বি হয়েছ, তোমরাই নাও।

ছেলেরা বলিল,—বেশ, আমরা রাজি।

বলিল বটে, কিন্তু কে যে 'লীজ' লইবে তাহাও ঠিক করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল

মেসের ব্যাপারে তপনের বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। নূতন আসিয়াছে বলিয়াও বটে, কতকটা নিরীহ বলিয়াও বটে। বসিয়া বসিয়া সে শুধু ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া সকলের এই প্রকার উষ্মা প্রকাশে তাহার বিস্ময় ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্মিত হইল এই দেখিয়া, যে ভুবনবাবু, যাহাকে সে অত্যন্ত সরল এবং অত্যন্ত ভালোমানুষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, চীৎকার করিতেছেন তিনিই সকলের চেয়ে বেশী।

একটি কোণে হাঁটুর উপরে চিবুক রাখিয়া সে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। অকস্মাৎ দ্বারের অন্তরাল হইতে কে যেন তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিল। সে বিলাস।

বাহিরে আসিতেই বিলাস তাহার হাতে একটা টান দিয়া বলিল,—ওখানে কি করছেন? চলুন, ছাদে যাই বরং।

তপনেরও বিরক্তি বোধ হইতেছিল। বলিল,—তাই চলুন।

ছাদে আসিয়া তপন কহিল,—মিথ্যে ক'দিনের জন্যে এখানে এলাম, বিলাসবাবু। আবার মেস খুঁজতে হবে কাল থেকে।

বিলাস বিস্মিত ভাবে বলিল,—মেস খুঁজতে হবে? কেন বলুন তো?

তপন বিরক্ত ভাবে বলিল,—তবে আর শুনলেন কি? দেখছেন না, নীচে কি কাণ্ড হচ্ছে? এ মেস কি টিকবে?

বিলাস হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—এই ব্যাপার! আমি বলি বুঝি আর কিছু! এমন কাণ্ড প্রতি তিন মাস অন্তর

হয়। হৈ-চৈ, গোলমাল, মেস গেল গেল,—তারপরে আবার যে কে সেই।

তপন কথাটা বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছিল না।

বলিল,—তাই নাকি?

মাথা নাড়িয়া বিলাস বলিল,—হাঁ। ওর জন্যে ভাববেন না। আমি এসে অবধি ওই রকম দেখছি। এরা এক টুকরো মাছের জন্যে ঝগড়া ক'রেও মরবে, আবার প্রাণান্তে কেউ কাউকে ছাড়তেও পারবে না। এখন দিনকয়েক অমনি চলবে। তার পরে দেখবেন কেউ মেস ছাড়ার নামও করছে না।

সকালে-সন্ধ্যায় তপন দুইটা ট্যুইশান করে। পনেরো টাকা করিয়া পায়। কিন্তু এই ত্রিশটি টাকার উপর তাহার ঘৃণার অন্ত নাই। ছাড়িতে পারে না, শুধু বাড়ীর ভাই-বোনগুলির মুখ চাহিয়া।

ছাত্র দু'টিই গবেট। সকালেরটি থার্ড ক্লাসে পড়ে। বয়স চৌদ্দ-পনেরোর বেশী নয়। কিন্তু দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কলেবরটি এমনই ভারিক্কি হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় বাইশ-তেইশের কম নয়। এ বাড়ীতে মোটা হওয়ার এপিডেমিক লাগিয়াছে। কুকুর-বেরাল হইতে কর্ত্তা-গৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেই অসম্ভব রকম মোটা। তাহার উপর নিয়মিত দুধ-ঘি পড়িতেছে। তা পড়ুক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে দুগ্ধ এবং ঘৃতের এক কণাও ছেলেটির মস্তিষ্কে পৌছিতেছে না, কেবলই মেদ বৃদ্ধি করিতেছে।

তবে বুঝিবার চেষ্টা আছে, পড়িবার জন্য শ্রমস্বীকারও করে। কিন্তু বুদ্ধিই এমনি মোটা যে কিছুতে বুঝিতে পারে না। এবং বহু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তপন যদি বা ব্যাপারটা বুঝাইতে সক্ষম হয়, ছাত্র পরের দিনই তাহা বেমালুম ভুলিয়া যায়।

সন্ধ্যার ছাত্রটিরও বুদ্ধি সেই প্রকারই। কেবল অত বোকা নয়, বরং ধূর্ত্ত। অত্যন্ত রোগা চেহারা। শীর্ণ মুখ। তাহাতে নাকের উপর ভাঁটার মতো চশমা। দিন রাত্রি কেশ ও বেশ

লইয়াই আছে, আর মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে কেমন করিয়া মাষ্টারকে ফাঁকি দিবে।

কোনো বিষয় না বুঝিলেও কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে, বোঝে নাই। আর কোনো কঠিন বিষয়ের অবতারণা হওয়ামাত্র তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে। হয় চট্ করিয়া ফুটবল খেলার গল্প আরম্ভ করে, নয় তো—

—মাষ্টার মশাই, একটু চা খাবেন?

—না। তারপরে শোনো—

—তবে এক কাপ কফি?

—দরকার নেই। তারপরে শোনো—

এবারে ছেলেটি হাত জোড় করিয়া বলিল,—একটু খান, স্যার। আপনার দৌলতে আমারও একটু হবে। শরীরটা ভারী ম্যাচ্ ম্যাচ্ করছে।

তপন পেন্‌সিলটা খাতার উপর রাখিয়া হতাশভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসে।

এমনি চমৎকার দু'টি ছাত্রের কাছ হইতে পড়ানোর নাম করিয়া টাকা লইতে তপনের বিবেকে বাধে। কিন্তু কি করিবে? তবে মনে-মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে কোথাও একটা ভালো চাকরী একবার জুটিলে হয়। সেই দিনই এই দুই গণ্ডমূর্খকে পড়ানোর দায় হইতে অব্যাহতি লইবে।

যখন তাহার মনের অবস্থা এই প্রকার তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটা ট্যুইশান জুটিয়া গেল।

পান্থনিবাস

খবরটা আনিয়া দিল তপনের একটি মামাতো ভাই, গভর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরী করে, সেই। তাহাদের আফিসের বড়বাবুর একজন গৃহশিক্ষক আবশ্যক।

সংবাদটা শুনিয়া তপন উল্লসিত হইল না। বরং ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—আবার ট্যুইশান ছোড়্‌দা? একটা চাকরী জোগাড় ক'রে দিতে পারো না? বড়লোকের গোমূর্খ ছেলে আর পড়াতে পারি না।

—ছেলে না রে, মেয়ে। শুনেছি বেশ বুদ্ধিমতী। অবশ্য তোর বয়সের কথা শুনে প্রথমে তিনি রাজি হন নি। তার পরে আমার মুখে তোর স্বভাব-চরিত্রের কথা শুনে রাজি হয়েছেন। তার ওপর যখন শুনলেন স্বজাতি···

বাধা দিয়া তপন বলিল,—ও-সব আবার কি কথা ছোড়্‌দা? স্বজাতি ব'লে···

ছোড়্‌দা হাতের খাতাখানি দিয়া তাহার মাথায় একটা টোকা দিয়া হাসিয়া বলিল,—না, না, সে সঙ্কল্প নেই। আর ভয়-ই বা কি, অমন শ্বশুর পেলে···

তপন হাসিয়া বলিল,—না, না, শ্বশুরের দরকার নেই, দরকার একটা চাকরীর। পারো তো তাই একটা জোগাড় ক'রে দাও।

ছোড়্‌দা হাসিয়া বলিল,—সব হবে। আপাতত কাল বিকেলে আমার আফিসে একবার আস্‌বি। সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

ছোড়্‌দার হাসি তপনের ভালো লাগে নাই। তথাপি বিকালে তাহার অফিসে গেল, সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিল এবং তাঁহার মেয়েটিকে পড়াইতেও রাজি হইল। এ বাজারে কুড়ি টাকা মাহিনার প্রলোভন্ তো বড় সহজ নয়।

চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে। বেতের মতো লিক্‌লিকে। শীর্ণ দু'টি হাতে দু'গাছি করিয়া সোনার চুড়ি ঢলঢল্ করিতেছে। মাথার চুল আলুথালু; পোষাক-পরিচ্ছদেও তেমন পারিপাট্য নাই।

মেয়েটি পড়ে, কেবল পড়ে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে মুখে একটা বিবর্ণতা আসিয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে এবং এই বয়সেই কেমন কোল-কুঁজো হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার খাতা দেখিয়া তপন বুঝিতে পারে, এত পরিশ্রম তাহার বৃথা যায় নাই। মেয়েটি পড়াশুনায় ভালোই।

অত্যন্ত স্বল্পবাক্, শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। এবং সে মেয়েও বড় নয়, ছোট। কিন্তু ছোড়্‌দার ঠোঁটের হাসিতে কি ছিল জানি না, তপন আজও তাহার পানে ভালো করিয়া চাহিতে পারে না। এমন কি, আজ পর্য্যন্ত একদিন তাহার নামটাও জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। পাঁচজনের কথায় জানিতে পারিয়াছে, শ্যামলী। শ্যামবর্ণের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় বাপ-মা এই নাম রাখিয়াছেন।

পান্থনিবাস

তপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসে। দেখে, শ্যামলী পূর্ব্ব হইতেই নিজের আসনে বসিয়া একাগ্রমনে অধ্যয়ন করিতেছে। তপন তাহার স্কুলের রুটিনের দিকে চাহিয়া দেখে, আগামী কল্য কি কি বই পড়া হইবে। তারপর এক একখানা বই টানিয়া লয় এবং আপনার মনে পড়াইয়া যায়। নিজে সে ভালো ছেলে ছিল। বহু কথা যাহা বইতে নাই নানা প্রসঙ্গে তাহাও বলিয়া যায়। বলিবার ভঙ্গীটিও চমৎকার। অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও এমন সহজ করিয়া বোঝাইতে পারে যে শ্যামলী মুগ্ধ হইয়া যায়। তপনের দুই ঘণ্টা পড়াইবার কথা, কিন্তু তিন ঘণ্টার আগে আর কোনো দিন পড়ানো শেষ হয় না। এমন কি ফিরিবার পথেও ভাবিতে ভাবিতে আসে কোনো কিছু পড়াইতে বাদ গিয়াছে কি না। পড়ানোর মধ্যেও যে এত আনন্দ আছে তাহা সে এই প্রথম অনুভব করিল।

তাহার অপর দুইটি ছাত্রের মতো এ বাড়ীতে খাওয়ানোর আয়োজন তত নয়। তবু থাকে। কখনও কমলালেবুর সরবৎ, কখনও বা দু'টি সন্দেশ।

শ্যামলীর ছোট ভাইটি বলিয়া দেয়,—মাষ্টার মশাই, দিদির নিজের হাতের তৈরী। কেমন হয়েছে?

তপন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে,—তাই না কি? বাঃ, বেশ হ'য়েছে তো।

এবং শ্যামলীর পানে না চাহিয়াই বোঝে, লজ্জায় ও আনন্দে তাহার মাথা বইটির উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁহার কথাতেও বোঝা যায় তপনের শিক্ষাদান-নৈপুণ্যে তিনিও খুশী হইয়াছেন। অবশ্য মুখে সে কথা বলেন না। বলেন,—

—আপনার পড়ানোর তো খুব সুখ্যাতি শুনছি, মাষ্টার মশাই। কিন্তু আমি ও-সব বুঝি না। এবারে যদি আপনার ছাত্রী ফার্ষ্ট হ'তে পারে তবে বলব, হাঁ।

—সুরেন্দ্রবাবুর মতো প্রবীণ লোকের মুখে 'মাষ্টার মশাই' ডাক শুনিয়া তপন অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু কিছু বলিতেও পারে না। শুধু ঘাড় নীচু করিয়া বলে,—দেখি তো।

৫

অনেক দিন পর্য্যন্ত তপন এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোনো কথা জানায় নাই; প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিল না। এত বড় একটা সংবাদ পৃথিবীতে অন্ততঃ আর একজন লোক জানিবে না এমন কথা মনে করিতেও কষ্ট হয়। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তপন মনে-মনে স্থির করিল, বিলাসকে বিশ্বাস করা যায়। ছোকরার মনের মধ্যে গোল নাই, কোনো জিনিসকে কদর্য্য রূপেও দেখে না।

তপন ভাবিয়া দেখিল, এ কথা বিলাসকে বলা যায়। এবং একদিন নিরিবিলি কথাটা পাড়িল। বেশী কিছু নয়, শুধু এইটুকু বলিল যে, একটি মেয়েকে সন্ধ্যার সময় সে পড়ায়।

কথাটা শুনিয়া বিলাস ছাদের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত একবার ছুটিয়া আসিল। সে যেন হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়।

তারপর সুস্থ হইয়া বলিল,—মরেছেন! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ও-কাজও করবেন না। আপনি তো মশাই ভীষণ লোক। আমি ভাবতাম···

বিলাসের হাসি এবং ছাদের উপর ছুটাছুটি দেখিয়া তপন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কেবলই বোকার মতো হাসিতেছিল। কিন্তু তাহার শেষের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইল; কহিল,—ও-সব আবার কি বলছেন,—ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে?

কিন্তু বিলাস তাহাতে কিছুমাত্র দমিল বলিয়া মনে হইল না। ছাদের উপর তপনের যে চৌকিটা পড়িয়া পড়িয়া অপর্য্যাপ্ত রৌদ্র ও বৃষ্টি উপভোগ করিতেছে তাহাতে একটা তেহাই দিয়া বলিল, —আমার কথা এখন তেতো লাগছে মশাই, কিন্তু পরে বুঝবেন। জানেন তো,—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে!" বলিয়াই গান ধরিয়া দিল,—"বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে…"

কথাটা এমনি ভাবে উড়াইয়া দেওয়ায় তপন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিলাসও আর সকলের মতো ব্যাপারটিকে কদর্য্য করিয়া দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। তপনের মনে হইতেছিল, এ কথা বিলাসকে না বলিলেই ছিল ভালো। কেন মরিতে বলিতে আসিয়াছিল!

ব্যাপারটিও এমন কিছুই নয়। একটি মেয়েকে সে পড়ায়। এমন বহু মেয়েকে বহু ছেলে পড়ায়। ইহার মধ্যে দোষের যদি কিছু থাকিত তাহা হইলে মেয়েদের অভিভাবকেরাই সর্ব্বাগ্রে সাবধান হইতেন। অবশ্য পৃথিবীতে অমিশ্রিত ভালো বলিয়া কিছুই নাই। কোথাও কোথাও গোলযোগ যে ঘটে না এমনও নয়। কিন্তু কোনো ভালো জিনিসকে গ্রহণ করিতে গেলে এটুকু মন্দের আশঙ্কাকে মানিয়া না লইয়া উপায় নাই। অন্যথায় মেয়েদের লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

একটি মেয়েকে সে পড়ায়। সে মেয়ে তাহার পানে চটুল চোখে চাহেও না, তাহাকে গলাধঃকরণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া

বসিয়াও নাই। অথচ এমনি মানুষের মন যে, এই সামান্য এবং নিতান্ত সাধারণ কথাটা শুনিবামাত্র কেহ বা চোখ মট্‌কাইয়া হাসিবে, কেহ বা কাসিবে, কেহ বা ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি টানিয়া বলিবে, বেশ!

তপন বিরক্তভাবে একটু দূরে ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিলাস আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত দিল। তপন কিছুই বলিল না। যেমন অন্যমনস্কভাবে দূরের দিকে চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

বিলাস আস্তে আস্তে বলিল,—রাগ ক'রেছেন?

তপন শুধু বলিল,—না। রাগ করব কেন?

—মশাই, আমি পাগল ছাগল মানুষ। আমার কথায় কেউ রাগও করে না, কেউ গ্রাহ্যও করে না। আমার সঙ্গে তাই কেউ পরামর্শ করতে আসেও না। আসল কথা কি জানেন, মানুষের মন বুঝে মনের মতো কথা বলতে আমি আজও শিখলাম না। অনেক ক্ষতিও হয় তার জন্যে।

একটু থামিয়া বিলাস আবার বলিল,—চুলোয় যাক মশাই। সেই জন্যে আমি কারও কথায় থাকিও না। আমি, বাবা, আসি যাই গুলি খাই, মাথা তো কখনও দেখি নি। বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বিলাস বলিল,—কিন্তু আমার মনে হয় মশাই, আপনি বরং ভালোই আছেন। মেয়েরা কাছের চেয়ে দূরে থাকলেই সাঙ্ঘাতিক। মেয়েদের সঙ্গ যারা পায় তাদের মনে পাপ জমে

কম। যারা পায় না, যেমন আমাদের গোলোকবাবু···যাক্ গে মশাই, ও সব পরের কথায় কাজ নেই। কিন্তু আপনি আমার গানটা শুনলেন না?

অস্থিরভাবে বাঁ হাতের উপর ডান হাত দিয়া চট্ করিয়া তালি মারিয়া বিলাস বলিল,—উঃ! বাদল গোঁসায়ের মতো গলা যদি পেতাম!

বিলাসের কথা শুনিয়া তপন হাসিয়া উঠিল। বলিল,—আপনার যত গান ছাঁদে, আর বাথরুমে। একদিন হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইতে তো শুনলাম না।

বিলাস বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—হারমোনিয়মে আমার স্থবিধে হয় না।

—কেন?

—কি জানি, মশাই! হাত চলে তো গলা চলে না, গলা চলে তো হাত চলে না। ভাবই আসে না। তার চেয়ে মশাই এ ভালো—"বাংলা মা তোর···"

সেই রাত্রে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিল।

গ্রীষ্মকালে মেসের প্রায় সকলেই ছাদে শোয়। কেবল দাদু আসেন না। ভদ্রলোক অহিফেন সেবনের পর একতালায় নিজের ঘরেই পড়িয়া থাকেন। আর আসে না তেতালার গোলোক বাবু।

কেন যে আসে না তাহা সকলেই জানে, এবং নিজেদের মধ্যে টেপাটেপি করিয়া হাসেও। কেবল জানে না তপন। কোনো দিন জানিবার চেষ্টাও করে নাই।

রাত তখন বারোটা কিম্বা তাহারই কাছাকাছি। তখনও সকলে ঘুমায় নাই। এক এক জায়গায় জটলা পাকাইয়া শুইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ নীচে কাহার স্খলিত কণ্ঠের চীৎকারে সকলেই লাফাইয়া উঠিল। এ মেসে এ চীৎকার কাহারও অপরিচিত নয়। মাসের মধ্যে দুই-একবার এইরূপ কাণ্ড হয়। তখন সকলেই সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসে। বিশেষ করিয়া আজ মাসের পয়লা তারিখ। আজ যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা সন্ধ্যা হইতেই সকলে করিতেছিল।

সকলে যখন ছুটিয়া নামিয়া আসিল, তখন দেখা গেল, মোহিত বাবু বারান্দার রেলিং ধরিয়া বসিয়া সশব্দে হুড় হুড় করিয়া বমি করিতেছে। আর সেখানে এত দুর্গন্ধ উঠিয়াছে যে কাহারও কাছে যাইবার উপায় নাই।

এ সমস্ত বিষয়ে বিলাস সকলের অগ্রণী। সকলে যখন নাকে কাপড় দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া, তখন সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া মোহিতের মুখ ধোয়াইয়া দিল, পরিধানের শ্লথ বস্ত্র ঠিক করিয়া দিল। তাহাকে কোলে তুলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিবার শক্তি তাহার ছিল না। বলিল,—উঠুন।

মোহিত উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। কম্পিত ডান

হাতখানি বাড়াইয়া বিলাসের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল,—বিলাসবাবু, এই শেষ। আর কোনো দিন নয়।

বিলাস তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিয়া বলিল,—ও কি! পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

মোহিত তেমনি ভাবে বসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—একশো বার হাত দোব। দোব না? আপনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লে কি হবে, বুদ্ধিতে বড়। পায়ে হাত দোব না?

—আচ্ছা, বেশ। এইবার উঠুন।

—আজ্ঞে না। আগে আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলব যে, আর কোনো দিন মদ ছোঁব না, তারপর উঠ্‌ব।

বিলাস তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল,—আচ্ছা, খুব প্রতিজ্ঞা হ'য়েছে। এইবার উঠুন।

মোহিত টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে আসিল। তাহার তখন দাঁড়াইবার শক্তি নাই। শুধু মেঝের উপরেই সে শুইতে যাইতেছিল। বিলাস ধমক দিয়া বলিল,—আবার ও কি হচ্ছে? দাঁড়ান, বিছানাটা পেতে দিই।

মোহিত অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল,—আজ্ঞে না। কিচ্ছু দরকার নেই। আমি এই পা-পোষের ওপর চমৎকার শোব।

এ কথায় বিলাস না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; কিন্তু পাশেই গোলোক এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। এইবারে ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল,—কেন আবার ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন মশাই? বাইরে তো বেশ ছিল।

বিলাস চুপি চুপি বলিল,—বমি ক'রেছেন যে

গোলোক কিন্তু অত খাতির করিয়া কথা বলিতে পারিল না। সে বেশ জোরে জোরেই বলিল,—আবার ঘরেও তো বমি করবেন! গন্ধে ভূত পালাবে। মাতালের কাণ্ড তো!

মোহিত সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—মাতালের কাণ্ড! আমি মাতাল? আলবৎ মাতাল! আমি মদ খাই। টাকা দিই তবে মদ খাই। কিন্তু তোমার মতো ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে তো চাই না।

হঠাৎ যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল। কিন্তু কথাটা মাতালের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য গোলোক বলিল,—Nonsense!

মোহিত ইহার উত্তরে আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল। বিলাস তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিল,—আবার কথা বলছেন? শুয়ে পড়ুন।

মোহিত নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া বলিল,—আজ্ঞে, এই শুলাম। ব্যস্, আর কথাটি কইব না।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা পরিষ্কার করিয়া না বলিলে গোলোকের প্রতি অবিচার করা হইবে। গোলোক অসচ্চরিত্র নয়; বরং সাধারণতঃ আমরা যাহাদের সচ্চরিত্র বলি তাহাদেরই

অন্তর্গত। কোনো প্রকার নেশা সে করে না, এমন কি পান-সিগারেট পর্য্যন্ত না। অন্য কোনো প্রকার বদখেয়ালও নাই। কেবল মোহিত যাহা বলিল, তাহার চরিত্রে সেই একটুখানি মাত্র কলঙ্ক।

কিন্তু তাও শুধুই চাওয়া, অত্যন্ত সঙ্গোপনে লুকাইয়া দেখা। কেহ এ কথা বলিতে পারিবে না যে, কোনো মেয়েকে দেখিয়া সে কোনো দিন হাসিয়াছে, কিম্বা কাহাকেও দেখিয়া রুমাল উড়াইয়াছে, অথবা অন্য কোনো প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছে। যাহাদের সে লোলুপ-নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, প্রায়শঃই তাহারা জানিতে পর্য্যন্ত পারে না যে, গোলোক তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। ভালো মন্দ নানা প্রকার মেয়েই তো আছে। বরং এমনও হইয়াছে যে, মেয়েদের চোখে চোখ পড়িলে সেই সর্ব্বাগ্রে চক্ষু নামাইয়াছে।

হয় তো এ এক প্রকার রোগ। মেয়েদের চোখে চোখ মেলিয়া চাহিতে পারে না, লুকাইয়া দেখে। তাহার ঘরের দক্ষিণের জানালা খুলিলেই ওদিকের বড় একটা বাড়ীর অন্দর মহল। তাহাদের মুক্ত জানালা দিয়া দেখা যায় গিন্নী, বউ, ঝি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখনও ঘরের ভেতরে, কখনও বা বারান্দা দিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। আর গোলোক তাহার ভাঙ্গা তক্তাপোষে শুইয়া একখানা বই আড়াল দিয়া অপাঙ্গে তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছে। বই আড়াল দেওয়া শুধু ও-বাড়ীর মেয়েদের ভয়ে নয়, মেসের ছেলেদের চোখেও ধূলি দেওয়ার উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু মেসের

ছেলেদের কিছুই জানিতে বাকী নাই। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মোহিত মাঝে মাঝে সে কথার উল্লেখ করে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেও চাপিয়া যায়।

ব্যাধিই বটে। হয় তো দেখিতে পায় শুধু ছ'খানি পা, নয় তো শাড়ীর প্রান্ত, বড় জোর সালঙ্কার মণিবন্ধ। জানালার পর্দ্দা প্রায়ই বন্ধ থাকে। কেবল ও-বাড়ীর একটি মেয়ে বড় বেহায়া। সে মাঝে মাঝে পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া জানালার পাশের খাটখানিতে সুন্দর দেহ এলাইয়া দিয়া বুকের উপর একখানি বই রাখিয়া পড়িতে বসে। তাহার দিকে মেয়েটি চায় কি না, তাহা সে আজও ধরিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস চায়। গোলোকের চেহারা মেয়েদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মতো নয়। কিন্তু নিজের চেহারা সম্বন্ধে সকল মানুষের মতো সেও যথেষ্ট সচেতন নয়।

মাঝে-মাঝে মেয়েটি ঠোঁট ছ'খানি ঈষৎ ফাঁক করিয়া কুন্দ দন্তে হাসে। কিন্তু সে হাসি পুস্তকের অংশবিশেষ পড়িয়া, অথবা তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়া, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার কোনো উপায় নাই। তথাপি গোলোক তাহার ভাঙ্গা তক্তাপোষে শুইয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া ওঠে এবং কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যায়।

মাঝে মাঝে মেয়েটির স্বামী আসে। অতি সুপুরুষ চেহারা। এই বাড়ীটি, কিম্বা এই মেয়েটি অথবা তাহার স্বামী সম্বন্ধে কোনো কথাই গোলোক জানে না। জানা তাহার পক্ষে সম্ভবও নয়।

তবু দীর্ঘদিন এই মেসে থাকিয়া এবং ইহাদের দেখিয়া ইহাদের সম্বন্ধে একটা কাহিনী নিজের মনেই তৈরী করিয়া লইয়াছে। সে কাহিনীর সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। মাঝে মাঝে তাহার অনুমানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘটনার মিল হয় না। তখন সে আবার সেই কাহিনীর কিছু অদল-বদল করিয়া প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে।

তাহার বিশ্বাস এই মেয়েটীর স্বামী কাছেই কোথাও চাকরী করে, এবং সম্ভবতঃ ভালো চাকরীই করে। কিন্তু সে জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হউক, সেখানে বাসা করিয়া স্ত্রী লইয়া যাইবার সুবিধা নাই। হয় তো দেশে ভদ্রলোকের বাপ-মাও নাই। সেখানেও একা থাকিতে মেয়েটির নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। তাই সে বারো মাস বাপের বাড়ীতেই থাকে।

হয় তো এ তাহার নিছক কল্পনা। ও ভদ্রলোক মেয়েটির স্বামী নাও হইতে পারে। মেয়েটি বিধবাও হইতে পারে। অল্প বয়সে বিধবা হইলে অনেক মেয়েরই বাপ-মা তাহাকে নিরাভরণ করিয়া এবং থান পরাইয়া রাখেন না। কিম্বা হয় তো মেয়েটির এখনও বিবাহই হয় নাই। অত বড় অবিবাহিতা মেয়ে আজকাল অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়। সিন্দূর? তা বটে! কিন্তু আজকাল সীমন্তের সিন্দূররেখা ক্রমেই যেরূপ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতেছে তাহাতে এতদূর হইতে মেয়েটির সীমন্তে সিন্দূর আছে কি না বলা কঠিন।

কিন্তু সে যাহাই হউক, গোলোকের ধারণা মেয়েটি বিবাহিতা এবং ওই ভদ্রলোকই তাহার স্বামী। এবং তাহার অনুমানের প্রমাণ স্বরূপ এ কথা উত্থাপন করা চলে কি না জানি না, কিন্তু ইহা সত্য যে, ভদ্রলোক আসিলে মেয়েটিকে আর মুক্ত বাতায়ন-পাশে খাটের উপর শুইয়া নভেল পড়িতে দেখা যায় না। সন্ধ্যা-বেলায় ঘরের আলো জ্বালিয়া চম্পক অঙ্গুলি দিয়া আর সে পর্দা সরাইয়া দেয় না। বারে বারে কারণে-অকারণে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরিও করে না। মেয়েটিকে আর সে-কয়দিন দেখা যায় না। শুধু তাহার সুতীক্ষ্ণ উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গোলোকের রক্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। শনি, রবি দুইটা দিন। সোমবার সকালে ভদ্রলোক চলিয়া যায়। গোলোক অধীর ভাবে সোমবারের প্রতীক্ষায় থাকে। সোমবার সন্ধ্যায় আবার তাহার দেখা পাইবে।

কোনো মেয়ে তাহার পানে চাহিলেই ধারণা করিয়া বসিবে মেয়েটি তাহাকে ভালোবাসে, এ বয়স গোলোকের পার হইয়া গিয়াছে। মেয়েটি তাহাকে ভালোবাসে এমন সন্দেহ ভ্রম-ক্রমেও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সে নিজেও বিবাহিত। ভালোবাসার আস্বাদ তাহার অবিদিত নয়। সেও যে মেয়েটিকে ভালোবাসিয়া ফেলে নাই এ সম্বন্ধেও কোনো সংশয় নাই। তবু ওই এক আনন্দ!

মেসের জীবনে মানুষের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। স্নেহ-মায়া মমতা এখানে দুর্লভ। মা নাই, বোন নাই, পত্নী নাই,—যাহারা পুরুষের জীবন মধুময় করিয়া তোলে, তাহাদের স্নেহস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার ফলে নারী সম্বন্ধে মানুষের মনের অন্ধকারে-অন্ধকারে বহু অপৌরুষেয়

এবং লজ্জাকর কামনা বাসা বাঁধেন ইহাকে অভিশাপই বলুন, আর ব্যাধিই বলুন, ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া মেসের জীবনে কঠিন।

মধ্যে খোলার বস্তি। ওদিকে বড় বাড়ীটার আলোকোজ্জ্বল কক্ষে একটি মেয়ে সুকোমল শয্যায় শুভ্র-সুন্দর দেহ এলাইয়া আপনার মনে পড়ে, আর এদিকে সে। গোলোকের জীবনে ওই এক আনন্দ। ভালোবাসা নয়,—কৌতূহল। তাহার কাছে সুন্দরী তরুণীটি একটি অদ্ভুত রহস্য, ঊর্ণনাভের মতো তাহার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তু দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

৬

সেদিন দুপুর বেলায় সকলে আফিস চলিয়া যাওয়ার পর তপন চুপ্ করিয়া নিজের ঘরে একলা বসিয়া ছিল। আগের দিন ল্যাম্বেথ এণ্ড কোম্পানীর আফিসের চাকরীর আশা শেষ হইয়া গিয়াছে। সেখানকার আফিসের বড় বাবু তাহাদের নিকট আত্মীয়। তপন বি-এ পাশ করার পর হইতেই তিনি তাহাকে একটা চাকুরী করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি একটা চাকুরী খালি হইয়াছিল। ল্যাম্বেথ কোম্পানী কয়েকটি বিদেশী ঔষধের এজেণ্ট। আফিসটি বড় নয়। জন তিনেক সাহেব, জন তিনেক মেম এবং পঁচিশ-ত্রিশ জন বাঙালী কেরাণী কাজ করে। তাহাদের 'নমুনা বিভাগে' একটি কর্ম্ম খালি হয়। কাজ কিছুই নয়,—লেবেল ও খামের ঠিকানা লেখা। পঁচিশ টাকা মাহিনা। পেটের দায়ে তখন সেই চাকুরীরই উমেদার হয়। বড় বাবু অনেক আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু গত কল্য তিনি তপনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যে, নিজের বিদ্যা, নিজের বুদ্ধি এবং নিজের জীবনের উপরও তাহার ঘৃণা হইয়াছে।

ট্যুইশান তাহার অনেকগুলি আছে। মাহিনাও এই চাকুরীটির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাহার উপর তো নির্ভর করা চলে না। ট্যুইশান আজ আছে, কাল নাই। সেই জন্যই তপন লেবেল-লেখা চাকুরীর প্রার্থী হইতেও সম্মত হইয়াছিল; এবং বহুদিন

ধরিয়া বড় বাবুর বাসায় এবং আফিসে হাঁটাহাঁটি ও খোসামোদ করিতেছিল।

বহুদিন অর্থাৎ প্রায় বৎসর খানেক। তখনও এই চাকুরীটি খালি হয় নাই। ঘুরিতেছিল আশায় আশায়। বড় বাবু তাহাদের দেশের লোক, একটু আত্মীয়তাও আছে। এক কালে ইঁহাদের অবস্থা ভালো ছিল না। সে সময় নানা ভাবে ইনি তপনের পিতার নিকট হইতে বহু উপকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু বহু উপকার সত্ত্বেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। মনের দুঃখে কলিকাতায় অতি সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ পদোন্নতি হইতে হইতে অবশেষে বড় বাবু হন।

বড় বাবু হইলেও চাল বাড়ান নাই। নিজে প্রত্যহ বাজার করেন, এবং সংসারে একটি ভৃত্যের কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন করেন। একজোড়া ছেঁড়া জুতা, এবং এক জোড়া গলাবন্ধ কোট, পোষাক বলিতে তাহাই। আফিসের পুরাতন লোকেরা বলে, ওই এক জোড়া কোটই তাহারা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। তাহাদের আরও বিশ্বাস আছে, এই আফিসে একটি চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে ওই দু'টি কোটও পুত্রের গায়ে চড়াইয়া দিয়া কিছুকাল পরে তিনি বিশ্রাম লইবেন। কিন্তু সে কালের এখনও অনেক দেরী। এখন হইতে গোঁফে তেল দিয়া লাভ নাই।

তাহার পিতার কাছ হইতে পত্র লইয়া প্রথম যখন তপন বড় বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তিনি তাহাকে পরম সমাদরেই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল সমাদরও ততই মন্দীভূত

হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার নিজের উপরই বিতৃষ্ণা জন্মিত। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত আর তাঁহার কাছে গিয়া কাজ নাই। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই সকল হীনতা গায়ে মাখিয়া বারে বারে তাঁহার দ্বারস্থ হইতে হইত।

নিকষকৃষ্ণ স্থূল দেহে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে সরিষার তৈল মর্দ্দন করা তাঁহার একটা বিলাস। তপনের তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময়ও ছিল এইটা। বড় বাবু একখানি ছোট্ট মলিন বস্ত্র পরিয়া তাহার উপর একখানি গামছা জড়াইয়া তেল মাখিতেন, আর সে পাশে বসিয়া সাংসারিক অভাব-অভিযোগ বিবৃত করিত।

বড় বাবু সমস্তই ধীরভাবে শ্রবণ করিতেন। অবশেষে মাথা দোলাইয়া বলিতেন,—সবই তো বুঝছি হে, কিন্তু কি করা যায় বল? প্রথমত চাকরী কোথাও খালি নেই। আবার তাও বলি, আজকালকার ছেলেরা ওই বি-এ, এম-এ পাশই করে, কিন্তু কিচ্ছু শেখে না। আমার এসিষ্টাণ্ট আছে,—এম-এ পাশ। কিন্তু তার অর্দ্ধেক কাজ আমাকেই ক'রে দিতে হয়।

বলিয়া অদূরবর্ত্তী গৃহিণীর দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিতেন। উদ্দেশ্য স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতা তিনি একবার উপলব্ধি করেন।

—সাহেব তখনই বলেছিল, মুখার্জ্জি, ও এম-এ-টেমে নিও না। ভালো দেখে চালাক-চতুর একটি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা ছেলে নাও। গ'ড়ে-পিটে মানুষ ক'রে নিতে পারবে। আমার মতিচ্ছন্ন! নিলাম তাকে। এখন নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। সাহেব আমার দুর্দ্দশা দেখে, আর হাসে।

গৃহিণী মনে মনে পতিগর্ব্বে পুলকিত হইয়া উঠিয়া মুখে বলিতেন,—তা বাপু, তুমি কতকাল রয়েছ। আর এরা ছেলেমানুষ, নতুন ঢুকেছে।

বড় বাবু বাধা দিয়া বলিতেন,—নতুন-পুরোনোর কথা নয় গিন্নি,—নতুন আমরাও একদিন ছিলাম। কিন্তু কোনো দিন এমন ভুল করতাম না। এরা ভুল করবে পদে-পদে। অথচ অহঙ্কার আছে ষোলো আনা। কি, না, এম-এ পাশ!

গৃহিণী অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিতেন,—হাঁ গা, তা আমাদের কেষ্ট যে কাজ করে তাও একটা জুটিয়ে দিতে পার না তপনের জন্যে?

কেষ্ট বড়বাবুর আফিসের প্যাকার। মালপত্র প্যাক করে, আর বড়বাবুর বাড়ীতে বিনা বেতনে সকালে-সন্ধ্যায় ফাই-ফরমাস খাটে। তপন মাথা নীচু করিয়া এই সকল কথা শুনিত, আর মনে-মনে ভাবিত, ধরণী দ্বিধা হও!

নির্জ্জন গৃহকোণে একা বসিয়া তপন আপন দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ ভুবনদা হুঁকা হাতে প্রবেশ করিলেন।

—কি করছেন? স্নানাহার হ'য়ে গেছে?

তপন তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিয়া ভুবনদাকে বসিবার জন্য জায়গা দিল। বলিল,—বসুন। না, এখনও হয় নি। আপনার হ'য়ে গেছে নাকি?

—না, এই তো আস্‌ছি।

বলিয়া তাম্রকূট সেবনের ফাঁকে ফাঁকে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন।

তপনের সঙ্গে ভুবনদা'র মাথামাথি খুব বেশী নয়। কতকটা নবাগত বলিয়া সে ভুবনদা'র সঙ্গে এখনও পর্য্যন্ত হাসি-তামাসা করে না। কে জানিত, এই ভদ্রতার জন্য এরূপ বিপদে পড়িবে!

একটা শোঁ-টান দিয়া প্রচুর ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে ভুবনদা হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। তারপর কোঁচড় হইতে একটা চিরকুট বাহির করিয়া বলিলেন,—দেখুন তো একবার, হ'য়েছে কি না! আপনারা বিদ্বান লোক, তাতে হালফ্যাশানের ছেলে। আপনাদের একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো।

চিরকুটে লেখা আছে :

প্রিয়তমে,

তুমি তো কাঁদিতেছ বসিয়া ঘরের ভিতরে।
আমিও কাঁদিতেছি বসিয়া মেসের ভিতরে॥
মনে ভাবিতেছি বুঝি পাগল হইয়া যাই।
কাজ কর্ম্ম করিতেছি বটে কিন্তু মন ভালো নাই॥
বিধি যদি পাখা দিতেন উড়িয়া যাইতাম বাড়ী।
আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দিয়া দিগ্‌দড়ি॥

সাগর যদি কালি হইত মৈনাক লেখনী।
তোমায় কত ভালোবাসি জানাইতাম এখনি ॥
একে মন উড়ু উড়ু প্রাণসখি তাহাতে
ডাকতেছে কোকিল।

তপন সুগভীর বিস্ময়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রতি চাহিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—হচ্ছে ?

ইহার পরে তাহার মতো শান্ত ছেলের পক্ষেও পরিহাস করিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল।

সে সোল্লাসে বলিল,—চমৎকার হচ্ছে। কিন্তু···

ভুবনবাবু হুঁকা তুলিয়া লইতেছিলেন। আবার নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,—কিন্তু শেষটা এখনও মিল ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। কোকিলের সঙ্গে কি মিল করা যায় বলুন তো? অবিশ্যি একটু ভাবলেই হয়, কিন্তু বেলা হ'য়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। খেয়েই একবার যেতে হবে গরাণহাটায়। এক খদ্দেরের বাড়ী তাগাদায়। বিভ্রাট কত !

তপন একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া বলিল,—কোকিলের সঙ্গে মিল ? উকীল দিয়ে মিল করা যায়। কিন্তু···

ভুবনবাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—উকীল আবার কি ক'রে আনা যায় ?

চট্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পকেট হইতে ফাউণ্টেন পেন বাহির

করিয়া তপন বলিল,—আনি, দেখুন তো। বলিয়া শেষ লাইনের নীচে বসাইয়া দিল :

আমি যেন ফাঁসির আসামী আর তুমি যেন উকীল॥

এমন চমৎকার মিল দেখিয়া ভুবনবাবুর তাক্ লাগিয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই লাইনটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—সার্থক লেখাপড়া শিখেছিলেন মশাই। এ মিল আমি সাত জন্ম ঘুরে এলেও করতে পারতাম না। কথায় বলে 'বিদ্যের জাহাজই বটে মশাই! আশ্চর্য্য! বলিয়া কাগজের টুকরাটা ভাঁজ করিয়া কোঁচড়ে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন,—তবে লিখতে লিখ্‌তে আমারও কিছু কিঞ্চিৎ হবে। কি বলেন?

ভুবনবাবু খড়মের খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ভুবনবাবু চলিয়া যাওয়ার পরেও তপন অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। যে সময়কে যৌবনকাল বলে সে তাহাতে পদার্পণ করিয়াছে। কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, যাহাতে আজ না হউক, দুই দিন পরেও দু' মুঠা অন্ন সংস্থান করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইবে না। তাহার যে বয়স তাহাতে নারীর আকর্ষণ কম নয়। তথাপি বিবাহের নাম শুনিলে সে ভয় পায় এবং পিতামাতার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছে না। আর এই ব্যক্তি যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়াও অবলীলাক্রমে দ্বিতীয়বার

দারপরিগ্রহ করিয়া বসিলেন। প্রথমা পত্নীর দীর্ঘদিনের স্মৃতি, বড় বড় ছেলেমেয়ের নিঃশব্দ কাকুতি, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ, কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না।

শুধু তাই নয়। ভুবনবাবু সর্ব্বপ্রকার প্রাচীনত্ব নির্ম্মোকের মতো ত্যাগ করিয়া অতীত যৌবনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কি দুঃসাধ্য সাধনাই না করিতেছেন! সে বিদ্যাসাগরী চুলছাঁটা আর নাই, হাল-ফ্যাশানে ছাঁটিতেছেন। কলপের কল্যাণে কাঁচা-পাকা কেশরাজি ভ্রমরকৃষ্ণ হইয়াছে। মুস্কিল হইয়াছিল গোঁফ জোড়া লইয়া। সেখানে আর কলপ কাজ দিতেছে না দেখিয়া তাহাও অবশেষে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছেন।

অথচ ইহাকে বিড়ম্বনাও বলা চলে না। ভুবনবাবুর মুখে দুঃখের চিহ্নমাত্র নাই,—দুঃখেরও না, লজ্জারও না। ভাস্কর যেমন করিয়া তাহার সৃষ্টিকে নিখুঁৎ করিয়া গড়িতে চেষ্টা করে, এই বৃদ্ধ নিজের দেহকে লইয়া সেইরূপ সাধনা সুরু করিয়া দিয়াছেন।

হয় তো একটু ভয়ও আছে। ভরা যৌবনে পুরুষ মানুষের নিজেকে রমণীরঞ্জন করিবার কথা এমন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। কম মূলধনে বড় কারবার ফাঁদিবার চেষ্টা যাহাদের করিতে হয়—ভয় তাহাদের পদে পদে। তাহাদেরই বহিরবয়বের চাক্‌চিক্য সাধনে যত্নবান হইতে হয়। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিবার জন্যও নানা চেষ্টা করিতে হয়।

৭

দিন কয়েক পরে বাড়ী হইতে যে পত্র আসিল তাহা পড়িয়া তপন মাথায় হাত দিয়া বসিল। ট্যুইশানের উপর ভরসা। সে আয়ও বেশী নয়। অথচ প্রকাণ্ড বড় একটা ফদ্দ আসিয়াছে।

দেশে এ বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে। তপন যে টাকা দেশে পাঠাইয়াছে রোগীর ঔষধ এবং পথ্যেই তাহার তিন-চতুর্থাংশ খরচ হইয়া গিয়াছে। ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় একেবারেই নাই। কিন্তু সে না হয় পরে হইবে, আপাততঃ আষাঢ় কিস্তির জমিদারের খাজনা না দিলেই নয়। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া তপন যেন অবিলম্বে পঞ্চাশ টাকাও পাঠায়। অন্যথায় ভীষণ ক্ষতি হইবে।

ইংরাজিতে উপায়হীনের অর্থোপার্জ্জনের ত্রিবিধ পন্থার নির্দ্দেশ আছে—ভিক্ষা, ধার এবং চুরি। এ বাজারে ভিক্ষা মেলা দুর্ঘট, ধার পাওয়াও অসম্ভব এবং তৃতীয় পন্থাও সহজ নয়। কাহারও পকেটে কিছু থাকে না। তথাপি ছোটদার কাছে গেলে যদি কোনো উপায় হয় ভাবিয়া রবিবারের বিকালে তপন ঠুক-ঠুক করিয়া শ্যামবাজার রওনা হইল। তপনের মেস হইতে শ্যামবাজার কম দূর নয়। কিন্তু হাঁটা তাহার এমন রপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, এটুকু আর দূর বলিয়া মনে হয় না।

ছোটদার বাসার বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই চাকরটা

দ্বার খুলিয়া দিল। তপন বারান্দা ঘুরিয়া সিঁড়ির মুখে পৌঁছিতেই দেখে বৌদি নামিয়া আসিতেছে। ভদ্রমহিলা বহুদিন পরে অকস্মাৎ তপনকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই দুই হাতে তালি বাজাইয়া সকৌতুকে বলিয়া উঠিল,—আরে বাপ! ঠাকুরপো যে! গন্ধে গন্ধে নাকি?

গন্ধের কথা শুনিয়া তপন একবার রান্নাঘরের দিকে চাহিল। হাসিয়া বলিল,—গন্ধে গন্ধেই বটে বৌদি! কি ব্যাপার বলুন তো? অভাবনীয় আয়োজন না-কি?

—অভাবনীয়ই ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমাকে এড়াবার উপায় নেই। আচ্ছা, এই তো সবে মাস কয়েক পড়াতে আরম্ভ ক'রেছ। এরই মধ্যে এত?

তপন বিস্মিত ভাবে বলিল,—সেদিন পড়াতে আরম্ভ করেছি, এরই মধ্যে এত? ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হ'ল না তো।

তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বৌদি বলিল,—থাক্, আর ন্যাকামিতে কাজ নেই। এই সুমুখের ঘরেই র'য়েছে, গেলেই বোধগম্য হবে।

তপন বিব্রত ভাবে বলিল,—আঃ! কি যে চেঁচান্ বৌদি! কে সুমুখের ঘরে রয়েছে? কি বোধগম্য হবে?

বৌদি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাত ঘুরাইয়া বলিল,—যার খোঁজে এসেছ সেই গো,—তোমার শ্যামলী। কেন মিথ্যে দেরী করছ? আমি তোমাদের জন্যে খানকয়েক লুচি ভেজে আনি। যা আবার আমার উনুনের অবস্থা!

বলিয়া চলিয়া যাইতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—কিন্তু যত দেরী হবে ততই তো তোমার সুবিধা। কি বল ঠাকুরপো?

ঠাকুরপো কিছুই বলিল না। আড়ষ্টভাবে সিঁড়ির মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু এমন করিয়া বেশীক্ষণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যেখানে সঙ্কোচের কোনো কারণ নাই সেখানে সঙ্কোচ দেখানোই সন্দেহজনক। শ্যামলী দোতালায় সুমুখের ঘরেই আছে। থাকিতে পারে। কিন্তু সে জন্য তাহার সঙ্কুচিত হওয়ার কোনোই কারণ নাই। যে মেয়েকে সে প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াইয়া আসিতেছে তাহার কাছে লজ্জাই বা কি, আর সঙ্কোচই বা কি?

বৌদি চিরকালকার ফাজিল মেয়ে। কোনো কালেই তাহার কথার রাখ-ঢাক নাই। একবার ঠাট্টার সম্পর্কের কাহাকেও পাইলেই হইল। তাহাকে নাচাইয়া ছাড়ে। তথাপি এটুকু বুদ্ধি তাহার থাকা উচিত যে, যাহার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রী সম্বন্ধ, তাহাকে এমন ভাবে জড়িত করিলে উভয় পক্ষেরই লজ্জার সীমা থাকে না। বিশেষ, ইহাই যখন তপনের জীবিকা তখন এই প্রকার রসিকতার ফল তাহার অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে শুভ হইতে পারে না। শ্যামলী কি আর বৌদির কথা শুনিতে পায় নাই? ওই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, পাড়ার ও-প্রান্তের লোকেরও কানে গিয়াছে!

কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তপন যত লজ্জিত এবং যত উত্যক্তই

হউক, নীচে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা সমীচীন বোধ করিল না। বৌদি এখনই আসিয়া পড়িতেও পারে। তাহার তো কাণ্ডজ্ঞান নাই। হয় তো উচ্চকণ্ঠে আবার একটা রসিকতা করিয়া বসিবে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সুমুখেই সেই ঘরটি। কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপন দেখিল ঘরে আর জনপ্রাণীও নাই। একটিমাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে,—সে সুমুখের বড় আয়নায় তাহার নিজেরই প্রতিবিম্ব। তপনের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল!

তাহা হইলে সমস্তই রসিকতা! বৌদি এতও পারে! কিন্তু তাহাকে আজ ভালো করিয়া নিষেধ করিয়া দিতে হইবে যেন শ্যামলীর নামের সঙ্গে তাহার নাম জড়াইয়া এরূপ রসিকতা আর কখনও না করে। তপন জানে, শ্যামলী এবং বড়বাবুর বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা এ বাড়ীতে যাতায়াত করেন, উভয় পরিবারের মধ্যে কি একটা সম্পর্কও না-কি আছে। কিন্তু সেই সম্পর্ক অনেক দূরের। বর্ত্তমানে চাকুরীর খাতিরে ছোটদা নিজে হইতেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

সোফায় বসিয়া তপন মনের আনন্দে পা নাচাইতেছিল। এমন সময় বৌদি দুই হাতে দু'খানি খাবারের রেকাবী আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। পিছনে-পিছনে চাকর দু' গ্লাস জল রাখিয়া গেল।

ঘরে শ্যামলীকে না দেখিয়া বৌদি বলিল,—ও কি! শ্যামলীকে কোথায় লুকোলে?

তপন কথা কহিল না। মিটি-মিটি হাসিয়া চোখের ইসারায় খাটের নীচে দেখাইয়া দিল।

বৌদি অজ্ঞাতসারেই একবার সেদিকে চাহিয়া বলিল,—না, সত্যি বল, কোথায় গেল সে ?

—খাটের নীচে নেই ?

বৌদি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ডাকিল,—শ্যামলী !

কোনো উত্তর আসিল না।

—শ্যামলী !

তপনের বিস্ময় গভীরতর করিয়া উত্তর আসিল,—কি বলছেন ?

—এদিকে এস।

তপন বোধ করি নিজের কানকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। বিস্মিত কৌতুকে বলিল,—বৌদি, আপনি কি ভেন্ট্রিলোকিজম্ জানেন ?

—জানি।

বলিয়া বৌদি সোজা পাশের ঘরে গিয়া শ্যামলীকে বাহু বন্ধনে বাঁধিয়া এঘরে আনিয়া হাজির করিল। এবং তপনকে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—কি দেখছ, ঠাকুরপো ? ম্যাজিকও জানি কি না ?

তপন আর কথাটি কহিল না। অধোমুখে বসিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিল। বেশ বুঝিল, রহস্যপ্রিয়া বৌদিদির হাতে পড়িয়া আজ আর তাহাদের দু'জনের নাকালের শেষ থাকিবে না।

বৌদি তপনের কাছে একটা টিপয় টানিয়া আনিল। তাহার উপর খাবারের রেকাবীটি রাখিল, তার পরে জলের গ্লাস।

বলিল,—তোমাদের দু'জনের কি কথা বন্ধ না-কি ঠাকুরপো ?

অনাবশ্যক জোরের সঙ্গে তপন বলিল,—না।

অত্যন্ত নিরীহ ভাবে বৌদি বলিল,—তাই তো ভাবছিলাম, কথা বন্ধ হ'লে পড়াবে কি ক'রে।

বৌদি আর একখানি রেকাবী শ্যামলীর হাতে তুলিয়া দিতে গেল। শ্যামলী দুই পা পিছাইয়া আসিয়া বলিল,—আমি এখন খেতে পারব না বৌদি।

বৌদি জোর করিয়া রেকাবী তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল,—বৌদি নয়, এখন থেকে দিদি বলবে। বুঝলে? দিদি।

এ কথার গূঢ়ার্থ শ্যামলী ধরিতে পারিল না। পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া বলিল,—আমি যে এই খেয়ে এলাম!

—তা হোক। ভদ্রলোকের বাড়ী এলে একটু মিষ্টি মুখ ক'রে যেতে হয়।

তপন এতক্ষণ মুখ নীচু করিয়া জলযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল,—কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীর ভদ্রলোকটিকে তো দেখছি না? তিনি কোথায় গেলেন।

শ্যামলীর পাশে আরাম করিয়া বসিয়া বৌদি বলিল,— ভদ্রলোকটিকে একবার মার্কেটে পাঠিয়েছি।

তপন আবার বলিল,—এ কাজটি তো ঠিক ভদ্রলোকের নয়। চাকর কি অসুস্থ?

—আজ্ঞে না। তিনি সুস্থই আছেন। কিন্তু কতকগুলো ফল-টল কিনতে হবে। তাঁর ওপর ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই ভদ্রলোককেই পাঠাতে হ'ল।

তপন হাসিয়া বলিল,—ছোটদাকে আমার বড় ভালোলাগে বৌদি। আপনি হুকুম করলে তিনি কিছুতেই 'না' বলেন না।

বৌদিও হাসিয়া জবাব দিল,—হুকুম কি সবাই করতে পারে ঠাকুরপো? ও একটা আর্ট। কিন্তু তোমারও ভাবনা নেই ভাই, আমার এই বোনটিকে আমি আমার সমস্ত বিদ্যে শিখিয়ে দোব।

বলিয়া গভীর স্নেহে শ্যামলীকে বাহু-বেষ্টনে বাঁধিয়া ফেলিল। শ্যামলী তখন লজ্জায় কাঠ হইয়া গিয়াছে। আর তপনের মনে হইল, হাতের রেকাবী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পালায়। কিন্তু তাহাতে লজ্জার কদর্য্যতাই বাড়িবে। যে-মেয়েকে প্রত্যহ সম্মুখে বসাইয়া পড়াইতে হইবে তাহার সম্মুখ হইতে আজ লজ্জা করিয়া পলাইয়া গিয়াই বা লাভ কি? বৌদি চিরকালই অমনি ফাজিল।

বস্তুত পক্ষে বৌদিরও দোষ ছিল না। কিছুদিন হইতেই শ্যামলীর সহিত তপনের বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে সুরেন্দ্রবাবু ছোটদার সহিত পরামর্শ করিতেছেন। তপন শুধু বি-এ পাশ করিয়াছে বলিয়া নয়, স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা সব দিক দিয়াই সুপাত্র। অবশ্য তাহার বাড়ীর অবস্থা ভালো নয়। এবং সুরেন্দ্রবাবু যে-ভাবে মেয়েকে তৈরী করিতেছেন তাহাতে তাহার পক্ষে পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করাও অসম্ভব। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু মন করিলে তপনকে যে-কোন সময়েই সেক্রেটারিয়েটে একটা ভালো চাকুরী যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। তাহাতে জামাতাও চিরদিন শ্বশুরের অনুগত হইয়া

থাকিবে, মেয়েও আদরে থাকিবে। তপনের উপর সুরেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি পড়িবার আর একটি কারণ, বড়লোকের বকাটে ছেলে তাঁহার দুই চক্ষের বিষ।

সে যাহা হউক, উভয়ের প্রাত্যহিক পরামর্শ যথাসময়ে বৌদির কর্ণগোচর হয়। শুধু বৌদি নয়, পাঁচ কান হইতে হইতে অবশেষে শ্যামলীর কানেও পৌঁছিয়াছে। জানে না কেবল তপন নিজে। বিবাহের এখনও দেরী আছে। এবং তপনের তরফে ছোটদাই তো মস্ত বড় অভিভাবক। যথাসময়ে সে তপনের পিতার কাছ হইতে সম্মতি আদায় করিয়া লইবে এ বিষয়ে সুরেন্দ্রবাবুকে একেবারে প্রতিশ্রুতিই দিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তপনকে, এমন কি ইঙ্গিতেও জানাইবার কোনো প্রয়োজন কেহ বোধ করে নাই। কেবল উভয়কে একত্র পাইয়া পরিহাস করিবার এমন চমৎকার সুযোগ বৌদি ছাড়িতে পারিল না।

তপন বিব্রত ভাবে কহিল,—আচ্ছা, হয়েছে। ছোটদার ফিরতে কত দেরী বলুন তো?

কিন্তু বৌদিদির মতো মেয়ে কিছুতেই দমিবার পাত্রী নয়। সে পূর্ব্বের মতোই পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল,—ছুটি দিয়েছি মোটে দু' ঘণ্টার। কিন্তু বোধ হয় তার চেয়ে একটু বেশী দেরী হবে।

ছোটদার বাপের শরীর ভালো নয়। কয়দিন আগে জ্বর

হইয়াছিল। সেই সংবাদ পাইয়াই বাজারে গিয়াছে কতকগুলা ফল আনিতে। সেখান হইতে যাইবে বড়বাজারে। তাহাদের দেশের একটি দোকানদার রবিবারে-রবিবারে আসে সওদা করিতে। যদি তাহার দেখা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গেই ফলগুলি পাঠানো হইবে। অন্যথায় রেলওয়ে পার্শ্বেলে। এত ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইলে দেরী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

শ্যামলী জিজ্ঞাসা করিল ছোটদার পিতার বয়স কত? তপন জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের দেশে ম্যালেরিয়া আছে কি না? তাহার নিজের গ্রামে ঘরে-ঘরে ম্যালেরিয়া। এমন লোক নাই যে একবার জ্বরে না পড়িতেছে। এবং ম্যালেরিয়া এমনই জ্বর যে, একবার ধরিলে আর নিস্তার নাই। দেখিতে দেখিতে মানুষকে রক্তহীন করিয়া ফেলে। শ্যামলীদের গ্রামেও ম্যালেরিয়া বড় কম নয়। দেশের বাড়ী তো সেজন্য তাহারা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছে। ক্বচিৎ-কখনও যায় তো তিন-চার দিনের বেশী থাকে না। তাও সে কয়দিন সকলে প্রত্যহ কুইনিন সেবন করে। তথাপি কি নিস্তার আছে? গেলবার তাহার ভাই পল্টু এমন ম্যালেরিয়া লইয়া আসিল যে, ছয়টি মাস তাহাকে উঠিতে হয় নাই। কেবল বৌদিদিদের দেশে ম্যালেরিয়া নাই। রুক্ষ দেশ বলিয়াই বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে তিনজনে চমৎকার গল্প জমিয়া উঠিল। তপন এমন করিয়া কখনও শ্যামলীর সান্নিধ্য উপভোগ করে নাই। শ্যামলী যে কথা কয়, তাহার কণ্ঠস্বর যে এত মিষ্ট তাহা সে ইতঃপূর্ব্বে

জানিবার অবসর একদিনও পায় নাই। আর শ্যামলী এই ভাবিয়া বিস্মিত হইল যে, তাহার মাষ্টার মহাশয় শুধু ইতিহাস ও ইংরাজি পড়ায় না—অতি চমৎকার হাসিতেও পারে।

হঠাৎ এক সময় তপন উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—এইবার উঠি বৌদি। অনেকক্ষণ গল্প করা হ'ল। ছোড়্‌দার সঙ্গে আজ আর দেখা হ'ল না। তাঁকে বলবেন আমি এসেছিলাম। পারি তো কাল বরং তাঁর আফিসেই একবার দেখা করব। একটু দরকারও আছে।

—উঠ্‌লে?—পরক্ষণেই শ্যামলীর পানে চাহিয়া বলিল,—কিন্তু তোমার তো গাড়ী এখনও এল না ভাই?

শ্যামলী উদ্বিগ্ন মুখে কহিল,—তাই তো দেখছি। হয় তো কেউ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছে। রাত হবে হয় তো!

—ঠাকুরপো কি তাহ'লে তোমাকে পৌছে দেবে? একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো। তুমি মেসে ফিরছ তো? তাহ'লে যাওয়ার পথে শ্যামলীকেও পৌছে দিয়ে যেও।

এতক্ষণের গল্পগুজবে উভয়ের সম্বন্ধ এমন সহজ হইয়া আসিয়াছিল যে, তপনও একবার দ্বিধা করিল না। বলিল, বেশ তো। শ্যামলীও দ্বিধা করিল না, সোজা তপনের পিছু পিছু পা বাড়াইল।

পাশাপাশি দুজনে গলির পর গলি ঘুরিয়া বড় রাস্তায় পড়িল। পাশ দিয়া যত লোক যায় অপাঙ্গে একবার শ্যামলীর দিকে চাহিয়া যায়, কেহ কেহ তাহার গা ঘেঁসিয়া যাওয়ার চেষ্টাও করে। তপনের এমন রাগ হয় যে, ইচ্ছা করে লোকগুলির গালে দুই চড় কষিয়া দেয়।

অনেকক্ষণ দু'জনে নিঃশব্দে চলিল। সুমুখেই একটা সিনেমা গৃহের গেটের দুই পাশে দুইটি প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি,—একটি অর্দ্ধনগ্ন নারী-মূর্ত্তি পুরুষের বাহু-বেষ্টনের মধ্যে এলাইয়া পড়িয়াছে; চোখ দু'টি আবেশে অর্দ্ধ-মুদ্রিত। এমন ছবি যে এই প্রথম তাহার চোখে পড়িল তাহা নয়। ইতঃপূর্ব্বে এই সকল ছবি তাহার মনে একটু তীব্র অথচ সুন্দর কামনারই উদ্রেক করিয়াছে। আজ প্রথম সে দেখামাত্র চোখ নামাইয়া লইল। মনে হইল, ইহার চেয়ে কুশ্রী, ইহার চেয়ে কদর্য্য আর কিছু হইতে পারে না।

কয়েক পা চলিতেই আর একটা বড় ছবি চোখে পড়িল;—একটা প্রকাণ্ড বড় অজগর সর্প একটা বিপুলকায় ব্যাঘ্রকে পাকে পাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

শ্যামলী জিজ্ঞাসা করিল,—এই ছবিটা দেখেছেন?

—নাঃ! বায়স্কোপ দেখার পয়সা কোথায়?

শ্যামলী যেন কথাটা ঠিক ধরিতে পারিল না। বিস্মিত ভাবে বলিল,—আট আনা তো।

মেয়েটির সরলতায় তপন হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—আট আনার মানে তো জানো না। একটা লোকের দু'দিনের খোরাক, আট দিনের জলখাবার।

কিন্তু শ্যামলী তথাপি আট আনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। কহিল,—তা হোক। ছবিটা ভারি চমৎকার। সাপের সঙ্গে বাঘের লড়াই দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তপন আর একবার শুধু হাসিল। কিছু বলিল না।

৮

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলিতেছে। এই সময়টা শ্যামবাজার হইতে আসিতে গেলে জনস্রোতের বিরুদ্ধে উজান বহিয়া আসিতে হয়। বাঙালী মানেই কেরাণী। তাহারা এখন ঊর্দ্ধমুখে, মরা ছাগলের মতো নিষ্প্রভ চোখে চাহিতে চাহিতে বাসায় ছুটিয়াছে। উদ্দাম সে জনস্রোত। ভিড় ঠেলিয়া চলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি কোথাও একটুখানি ফাঁক পাওয়া যায় তো ফেরীওয়ালা পথ আটকায়। কেহ একটা নকল ফাউণ্টেন পেন একেবারে চোখের উপর উঁচু করিয়া ধরে, মানুষ চমকিয়া থামিয়া পড়ে। নানা প্রকারের ফেরীওয়ালা,—কারও হাতে একগোছা রুমাল, কাহারও চাবির রিঙ্, কান-খোদো, দাঁত-খোদো, পয়সায় পঁচিশটা সূচ, জামার বোতাম, আরও কত কি।

কিন্তু আলোকিত জনবহুল রাজপথে পথ চলিতে তপনের মনে হইতেছিল, এ যেন অন্য কোনো শহর,—কোনো রূপকথার মায়াপুরী। দুই পাশের দোকানগুলি হইতে নানা বর্ণের আলো পথচারীর মুখের উপর বিচ্ছুরিত হইতেছিল। এতখানি পথ সে অত্যন্ত হালকা ভাবেই হাঁটিয়া আসিল।

বুক-পকেটে বাড়ীর চিঠিখানি আছে। কিন্তু তাহা যেন আর তেমন পীড়া দিতেছে না। অকস্মাৎ সে যেন একটা আশার

আলো দেখিয়াছে। মনে হইতেছে, দুঃখ আছে, দুশ্চিন্তা আছে, থাক, কিন্তু কোথায় যেন জীবনের একটা অবলম্বনও মিলিয়া গিয়াছে। জীবন আর যেন নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা নৌকা নয়। সে নৌকার গতি যত মন্থরই হউক, তার একটা লক্ষ্য আছে, একটা গন্তব্য আছে। একদিন না একদিন সেখানে পৌছিতে পারিবেই। এই একটা সন্ধ্যায় তাহার জীবনে কি যে ঘটিয়া গেল ভগবান জানেন, সমস্ত মন রাজপথের মতো আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল।

মনে হইতে পারে, সে শ্যামলীকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে, এ আনন্দ তাহারই। কিন্তু তপন জানে শ্যামলীকে ভালোবাসার কথা এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার মনেই উদয় হয় নাই। শ্যামলী নিতান্তই ছোট মেয়ে। তাহাকে লইয়া ভালোবাসা-বাসির খেলা চলিতে পারে মাত্র। ভালোবাসার সে জানে কী? কোথায় বা পাইবে পরিণত নারী-মনের সুগভীর প্রশান্তি, কোথায় বা পাইবে ঝঞ্ঝার মতো উদ্দামতা। শ্যামলী একটি ছোট মেয়ে, যে শুধু প্রজাপতির মতো লঘুভাবে পল্‌কা হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতে পারে।

না, ভালোবাসা নয়। শ্যামলীর চোখে চোখ রাখিয়া সে কথা বলিতে পারে না সত্য, কিন্তু সে তাহার বহুদিনের সংস্কার বশে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে। অনাত্মীয় মেয়ের—তা সে বালিকাই হউক,—কিশোরীই হউক, আর মহিলাই হউক,—কাহারও সংস্রবে আসিবার সুযোগ পায় নাই। সেই অনভ্যাসের জন্যই শ্যামলীর

চোখের দিকে, চাহিতে পারে না। এ সঙ্কোচ নিতান্তই পল্লীসুলভ।

ভালোবাসা নয়। কিন্তু কোথায় যেন কি একটা ঘটিয়াছে। আকাশে-আকাশে যে-জ্যোতিঃ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, কেমন করিয়া তাহারই একটা কণা তপনের মনের যন্ত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এ আলো শ্যামলীর নয়ন-কোণ হইতে বিচ্ছুরিত হয় নাই, কিম্বা অপর কোনো বিশেষ একটি নারীর নয়ন-কোণ হইতেও না। আজ সন্ধ্যায় তাহার মানস-কমলের দলগুলি মেলিবার কথা ছিল, আজ সন্ধ্যায় তাহার মনের লীলাকমল আকাশের অজস্র আলো সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিল।

মেসে যখন পৌঁছিল তখন তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। বাঁ হাতে ললাটের ঘাম মুছিয়া তপন পাঞ্জাবীটা আলনার উপর ছুঁড়িয়া দিল। অনেকটা পথ হাঁটিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু মাদুরখানির উপরই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

ছোটদার সঙ্গে দেখা হইল না। অথচ দেখা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাড়ীতে টাকা না পাঠাইলেই নয়। যে দেশ! কাহারও কাছে হাত পাতিলে একটা পয়সা পাওয়া যাইবে না। ছোটদার কাছে আছে কি না কে জানে! থাকিলে অবশ্য সে 'না' বলিবে না। তাহার কাছ হইতে টাকাটা ধার করিয়া পাঠাইয়া

দিতে পারিলে আপাততঃ কিছু দিন সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। আজ আর হইল না। কিন্তু কাল তাহার আফিসে নিশ্চয় করিয়া একবার দেখা করিতে হইবে।

অনেকটা হাঁটিয়া তপন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল। তাহার ঘরে কুঁজা নাই। কতকটা পয়সার অভাবে, আর কতকটা কুঁড়েমির জন্য একটা কুঁজা আর এতদিনের মধ্যে কেনা হইয়া ওঠে নাই। আর মুখুয্যে মহাশয় এ-ঘরে এতদিন ধরিয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বোধ হয় জলতৃষ্ণা পায় না। নহিলে যে গোছালো লোক তিনি, তাহাতে একটা কুঁজা নিশ্চয়ই আনিতেন।

তপনের আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু এ মেসে সকালে কি সন্ধ্যায় চাকরকে ফরমাস করিবার উপায় নাই। এত বড় মেসে,—একটি মাত্র চাকর। সকালে কি সন্ধ্যায় ফরমাস করিলে বাবুদের আহারে দেরী হয়।

রবিবারের দিন। মেসের অধিকাংশ ঘর তালাবন্ধ। বাবুরা শনিবার সন্ধ্যায় দেশে গিয়াছে। সোমবার সকালে ফিরিবে। বাড়ী যাওয়া কম গোলোকবাবুর। তপন আস্তে আস্তে তেতালায় গেল। একতালায় গেলেই পারিত। কিন্তু ভাবিল, তবু গোলোক-বাবুর ঘরে গিয়া খানিকটা গল্প করা যাইবে। সমস্ত সন্ধ্যা একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালোও লাগে না।

গোলোক দক্ষিণের বড় বাড়ীটার দিকে চাহিয়া একখানি বই নামমাত্র খুলিয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল।

তপন ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—জল আছে?

তপনের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া পাশ ফিরিয়া গোলোক বিরক্ত ভাবে বলিল—কি ?

জলের কুঁজার কাছে বসিয়া তপন তাহার পানে না চাহিয়াই বলিল,—একটু জল।

অকস্মাৎ গোলোক ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল,—জল নেবেন না বলছি।

বিস্মিতভাবে তপন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। কথাটা গোলোক পরিহাস করিয়া বলিতেছে, কি সত্যসত্যই, বোধ করি তাহাই স্থির করিবার জন্য।

শান্তভাবে বলিল,—এক গ্লাস জল···

গোলোক পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিয়া বলিল,—এক গ্লাস ? Not a drop. কুঁজো কিনতে হয়, বুঝলেন ? বাজারে যাবেন, তিনটি আনা খরচ ক'রে একটি কুঁজো কিনে আনবেন। কেবল মুফতে চালাবার চেষ্টা ! এক গ্লাস জল ! জল নিজের হাতে নীচে থেকে তেতালায় ব'য়ে আনতে হয়। এক ফোঁটা পাবেন না···Not a drop.

এক গ্লাস জলের জন্য যে এত বড় বক্তৃতা শুনিতে হইবে তাহা তপন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কোনো মানুষ যে তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতে আপত্তি করিতে পারে তাহাও সে ইতঃপূর্ব্বে শোনে নাই। কিন্তু তপন কলহ করিল না। জলের কুঁজা হইতে গ্লাসটি নামাইয়াছিল, সেটি কুঁজার মুখে পুনঃ স্থাপন করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িল। একতালায় গিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া খাইয়া আবার আপনার মাদুরখানির উপর গা গড়াইল।

অনেকক্ষণ পরে বিলাসের পায়ের শব্দ পাইয়া তপন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এতক্ষণে একজন গল্প করিবার লোক পাওয়া গেল।

—এই যে বিলাসবাবু! এত দেরী ?

বিলাস আজ আর গানও গাহিতেছে না, বক্তৃতাও করিতেছে না। বরং তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তিরই আভাস পাওয়া গেল।

উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল,—দাঁড়ান মশাই, আগে জামা-কাপড় ছাড়ি!

আধ ঘণ্টা পরে বিলাস নামিয়া আসিয়া তাহার মাদুরের একাংশে গিয়া বসিল। সে উচ্চ হাসি নাই, বক্তৃতা নাই, বাদল গোস্বামীর অনুকরণে গান গাহিবার চেষ্টাও নাই। আসিয়া বসিল নিঃশব্দে।

তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্ন মুখে তপন বলিল,—কি খবর ?

একটু ফিকা হাসিয়া বিলাস বলিল,—খবর ভালোই। আসছে মাস থেকে চাকরীটি খস্‌ল।

—তার মানে ?

—মানে তো বেশ স্পষ্টই।

তপন বাধা দিয়া বলিল,—না, না। কিন্তু আজ রবিবার, আজকে খবর পেলেন কি ক'রে ?

বিলাস ক্লান্তভাবে সেইখানেই শুইয়া পড়িল; বলিল,—কেরাণীর আবার রবিবার তপনবাবু! দরকার পড়লে আমাদের সব বারেই

যেতে হয়। এখনও অবশ্য আমার কাছে নোটিশ আসে নি। কিন্তু খসড়া হ'য়ে গেছে, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম।

তপন দুঃখিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এ বাজারে চাকরী যাওয়ার অর্থ যে কি তাহা সে ভালো করিয়াই জানে।

একটু পরে বিলাস ফিক্ করিয়া হাসিল। বিছানায় অকারণেই একটা গড়াগড়ি দিয়া বলিল,—সকালে যখনই গোলোকবাবুর মুখ দেখিছি তখনই জানি আজ একটা অঘটন ঘটবেই। ঠিক তাই।

তপন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—ও-সব আবার কি কথা মশাই? এর মুখ দেখা ভালো, ওর মুখ দেখা খারাপ, এ-সব তো···

—সেকেলে লোকের লক্ষণ? না? আপনারা তো এ-সব মানবেন না মশাই? কিন্তু মেস শুদ্ধ সবাইকে জিগ্যেস ক'রে দেখুন কথাটা সত্যি কি না!

উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে তালি বাজাইয়া বিলাস বলিল,—গোলোকবাবুর মুখ দেখলে সেদিন আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস না হয়, আপনি কাল সকালে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন।

দুঃখ যাহাদের নিত্য সহচর তাহাদের পক্ষে কুসংস্কারকে যাচাই করিয়া দেখিবার মতো সাহস সংগ্রহ করা কঠিন। এমনিতেই তো তাহাদের জীবনে দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই। কি করিয়া জানা যাইবে, এ দুর্ভাগ্য রামের মুখ দেখার ফল, কি শ্যামের মুখ দেখার ফল?

বিশেষ কোনো লোকের মুখ দেখিয়া স্বেচ্ছায় দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিবারই বা কি প্রয়োজন?

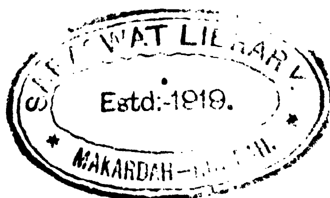
তপন মাথা নাড়িয়া বলিল,—না মশাই, কাজ নেই আমার গোলোকবাবুর মুখ দেখে!

বিলাস হাসিয়া বলিল,—তবে যে বললেন, বিশ্বাস করেন না?

—বিশ্বাস করি না সত্যিই, কিন্তু অবিশ্বাস করারও সাহস নেই। যাক্—এখন আপনি কি করবেন?

বিলাস উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—যা হয় হবে মশাই! আপনিও যেমন! তার চেয়ে চলুন, কেউ আসার আগেই চুপি চুপি রান্নাঘর থেকে খাওয়াটা সেরে আসা যাক্। কি বলেন?

তপনও উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—সেই ভালো।



৯

অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর···

ডিসেম্বরে আসিয়া মেস একেবারে চড়ায় ঠেকিয়া গেল, আর চলিতে চাহিল না। এবারে আর মাছের মুড়া নয়, রীতিমত আইনের তর্ক। সহজে যে মীমাংসা হইবে তাহার কোনো সম্ভাবনাই রহিল না।

প্রত্যেকে অপরের ঘরে গিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল, এতকালের মেস এইবার উঠিল। প্রত্যেকে অপরকে এই ব্যাপারের জন্য দোষী করে এবং অবসর সময়ে আগামী মাসে উঠিয়া যাইবার জন্য সুবিধামত মেসের খোঁজ করে।

ইতোমধ্যে তপনের একটা সুবিধা হইয়াছে। হইয়াছে বলিলে ভুল বলা হইবে, তবে হওয়ার আশা দেখা দিয়াছে। এখন তাহার কপাল আর অবিনাশবাবুর হাতযশ।

জানুয়ারী মাসে অবিনাশবাবুর আফিসে একটা চাকুরী খালি হইবে। বেতন অবশ্য বেশী নয়, ত্রিশ টাকা। অবিনাশবাবু এই চাকুরীটি তপনকে দিবার জন্য সাহেবকে বলিয়া রাখিয়াছেন। হওয়ার আশাই ষোল আনা। তবে তপনের যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাতে এমন সৌভাগ্য যে তাহার হইবে এ আশা কিছুতে করিতে পারিতেছে না।

গোড়ায় ত্রিশ টাকার কথা শুনিয়া সে একটু দ্বিধা করিয়াছিল।

কিন্তু অবিনাশবাবু বলেন, এ বাজারে তাহার চেয়ে বেশী আর কোথাও মিলিবে না। কথাটা সত্য, এবং তপন নিজেও অনেক ঘুরিয়া দেখিয়াছে। সতৃষ্ণ নয়নে বি-এ পাশের সার্টিফিকেট-খানির উপর একবার চোখ বুলাইয়া বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কিন্তু জানুয়ারীর এখনও অনেক দেরী আছে। ইতোমধ্যে অবিনাশবাবুর একটি ছেলে কলিকাতায় পড়িবে বলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের গ্রামের স্কুলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। পরীক্ষাও দিয়াছে, পাশও করিবে নিশ্চিত। কিন্তু কলিকাতার, ভালো স্কুলে পড়িতে গেলে শুধু সার্টিফিকেটে কুলাইবে না, মৌখিক পরীক্ষা করিয়া যাচাই করিয়া লইবে। ছেলেটি কতখানি পড়িয়াছে, আর কতটা ঘুড়ি উড়াইয়াছে সে বিষয়ে অবিনাশবাবু স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। সেই জন্য এই কয় দিন ছেলেটিকে একটু তালিম করিয়া দিবার জন্য তপনকে অনুরোধ করিয়াছেন। সুতরাং চাকুরী হউক আর না হউক আপাততঃ এই একটি কাজ তাহার জুটিয়াছে,—অবশ্য বিনা মাহিনায়।

মুখুয্যে প্রায়ই মুখ টিপিয়া হাসেন, মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলেন,—কি হে, ছেলে তো খুব পড়াচ্ছ। চাকরীর কত দূর?

তপন মনে মনে বুঝিতে পারে, অবিনাশবাবু তাহাকে ঠকাইতেছেন। সমস্তই ভাঁওতা। কেবল ছেলেটাকে প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত করিবার জন্যই তিনি এরূপ করিতেছেন। তবু সাহস করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণাও করিতে পারে না। যদি

ব্যাপারটা সত্যই হয়! কাজ কি চটাইয়া! একটা ছেলে পড়ানোর বেশী তো নয়। এ আর এমন কি!

মুখুয্যের প্রশ্নের উত্তরে তপন বোকার মতো হাসিয়া বলে,—দেখি তো, কি হয়!

মুখুয্যে হো হো করিয়া হাসিয়া বলেন,—দেখ, দেখ। আমরা তো পনেরো বছর দেখলাম, তুমিও কিছু দিন দেখ। শুধু দেখা নয় ভাই, ও অবিনাশ, ত্রিভুবন দেখিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু তপন আর কিছু বলে না। মুখুয্যেকেও সে চেনে। এখনই একখানা কথাকে সাতখানা করিয়া অবিনাশবাবুর কাছে লাগাইবেন। অমনি তাহার উপর অবিনাশের যেটুকু স্নেহ আছে সেটুকুও যাইবে। গুণে তো কাহারও ঘাট নাই।

কিন্তু অবিনাশের স্নেহ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রবিবারে তপন যখন কাপড়-জামায় সাবান দিতে যায় সেই সঙ্গে অবিনাশের এবং তাঁহার ছেলেরও দুই একটা গেঞ্জি, দুই একখানা বালিশের অড় আসিয়া জোটে।

—সাবান দিতে যাচ্ছ না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবিনাশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলেন,—আমার একটা গেঞ্জিতে সাবান দিলে হ'ত। বুড়ো বয়সে আর পারিও না।

বলিয়া মধুরভাবে হাসেন।

তপন সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলে,—দিন না আমাকে। একটা গেঞ্জিই তো!

অবিনাশ তেমনি মধুরভাবে হাসিয়া বললেন,—তুমি আবার দেবে সাবান দিয়ে? তোমরা সব গ্রাজুয়েট লোক!

তপন হাসিয়া বলিল,—তা হোক। দিন।

এ কথা বলিতে পারিল না যে, তুমি না হয় বুড়োমানুষ, কিন্তু তোমার অত বড় ছেলে রহিয়াছে সেও তো সাবানটা দিয়া দিতে পারে!

ছেলেটা আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর অবিনাশের এতটুকু কর্তৃত্ব করিতে সাহস হয় না। ছেলে বাপের মুখের উপর সমানে জবাব দেয়। সুতরাং তপনের উপরই অবিনাশের স্নেহ শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। অবিনাশের স্নানের সময় তপন যদি স্নান করিতে গেল তো রক্ষা নাই। অবিনাশ অবধারিত কাপড়খানা ভুলিয়া ফেলিয়া আসিবেন। সে কাপড় তপনকে কাচিয়া মেলিয়া দিতে হইবে। আফিস যাওয়ার সময় অবিনাশের হঠাৎ খেয়াল পড়ে, ডাঈং ক্লিনিং হইতে কাপড়টা আনা হয় নাই। সামনেই ছেলেটা বসিয়া বসিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মতো পা দুলাইতেছে। কিন্তু ডাক পড়ে তপনের। তাহাকে ছুটিয়া ডাঈংক্লিনিং হইতে কাপড়টা লইয়া আসিতে হয়।

হয় তো বিকালে একটা কাজে তপন কোথাও বাহির হইতেছে। অবিনাশবাবুর ছেলে রেলিং ধরিয়া দাড়াইয়া পা নাচাইতেছে আর বাহিরের মাঠে ছেলেদের খেলা দেখিতেছে। তপনকে বাহির হইতে দেখিয়া বলিয়া বসিল,—

—আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?

যাওয়ার মুখে বাধা পাইয়া তপন বিরক্তভাবে বলিল,—হ্যাঁ। কেন?

—বাবা পয়সা দিয়ে গেছেন তামাক আর টিকে আনবার জন্যে। তাঁর আফিস থেকে ফেরবার আগেই এনে দিতে হবে।

—তা কি ক'রে হবে? আমার ফিরতে দেরী হবে।

—আর আফিস থেকে এসে বাবা তামাক পাবেন না?

তপন বিরক্তভাবে বলিল,—তা কি করব? তুমি নিয়ে এসো না, ব'সেই তো আছ।

ছেলেটি অম্লানবদনে বলিল,—আমি পারব না।

রাগে এবং অপমানে তপনের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে যেন অবিনাশের মাহিনা-করা চাকর! কিন্তু দুঃখ সহিয়া সহিয়া অনেক অভিজ্ঞতাই তাহার হইয়াছে। মনের রাগ মনেই চাপিয়া রাখিয়া নীরবে পয়সার জন্য হাত বাড়াইল। জানুয়ারী মাসটা আসুক তো। তার পর দেখা যাইবে।

তপন আগে তামাক ও টিকা আনিয়া তার পর কাজে বাহির হইল। অবিনাশের দৌলতে তাহার কাজ অনেক বাড়িয়াছে।

এদিকে মেসের গোলমালও ক্রমেই জটিলতর হইতেছে।

প্রথম নম্বর, তেতালায় একটা ভালো সীট খালি পড়িয়াছে। কোণের দিকের ঘরখানি ছোট। তাহাতে একটিমাত্র সীট্। সেই ঘরে থাকিত মনোহর রক্ষিত। লোকটি বিজ্ঞাপনের

ক্যানভাসার। সকালে মাথায় চাদর জড়াইয়া বাহির হইত,—কোনো দিন ফিরিত দুইটায়, কোনো দিন তিনটায়, কোনো দিন বা দিনে আর ফিরিতই না। রাত্রে তাহার ভাত ঢাকা থাকিত। কোন্ সময় যে চুপি চুপি খাইয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িত কেহ টেরও পাইত না। বেঁটে, শক্ত সমর্থ লোক। টং টং করিয়া সারা দিন এবং রাত্রি কলিকাতা শহর চষিয়া বেড়াইত।

কিন্তু মনোহর একা ঘরখানির ভাড়া দিলেও সে একা থাকিত কমই। মাঝে মাঝে তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু পরমেশ আসিয়া জুটিত। পরমেশ মনোহরের সঙ্গেই এম-এ পাশ করিয়াছে। কিন্তু তাহার পর কি যে করে, আর কি করে না কেহই বলিতে পারে না। কলিকাতা শহরে তাহার সম্বলের মধ্যে একটা লম্বা ঢিলা কোট, একটি সার্ট আর একজোড়া কাপড়। সার্ট, কোট আর একখানি কাপড় পরনেই থাকে। বাকী একখানি কাপড়, খানদুই বই এবং আরও কি কি জিনিস একখানি খবরের কাগজে মুড়িয়া বগলে করিয়া ঘোরে। তাহার কোনো স্থায়ী ঠিকানাও নাই। সকালে কোনো এক বন্ধুর বাড়ীতে চা খাইয়া এলবার্ট হলে গিয়া খবরের কাগজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে। বিকালে কোনো দিন যায় মিটিঙে, কোনো দিন চার্চ্চে, কোনো দিন বা ব্রাহ্মমন্দিরে। কোথায় যে খায় তাহারও কোনো স্থিরতা নাই। হয় তো রাত্রি দুইটার সময় ক্লান্তদেহে ফিরিয়া আসিয়া মনোহর আহার করিতে বসিবে। ভাতের থালা যেমনকার তেমনি ঢাকা

দেওয়া আছে। ঢাকা খুলিয়া দেখে ভাত নাই, কে যেন খাইয়া গিয়াছে। উপরে গিয়া দেখে শ্রীপরমেশ তাহার বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া আছে। তাহার কাছে মনোহরের ঘরের দ্বিতীয় চাবিটি থাকে।

সে যাই হোক, মনোহর মেসের কোনো কথায় থাকে না। তাহার নিজেরই কাজ এত যে, তাহার সঙ্গে মেসের কাহারও বড় একটা দেখাই হয় না। মাঝে মাঝে তাহার মুখ-প্রক্ষালনের শব্দে মেসের বাবুরা অর্দ্ধরাত্রে জাগিয়া ওঠে। বুঝিতে পারে, মনোহর-বাবু এতক্ষণে ফিরিলেন।

মুখপ্রক্ষালনেরও বাহাদুরী আছে। সে একটা দেখিবার মতো ব্যাপার। কলিকাতা শহরে নানা রোগের বীজাণু হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অদৃশ্য বীজাণু সম্বন্ধে তাহার সতর্কতার অন্ত নাই। ফুটপাথ ধরিয়া দিব্য চলিতেছে, হঠাৎ ট্রপিক্যাল মেডিক্যাল কলেজের কাছে আসিয়া ও-ফুটপাথ ধরিল। এদিকটায় বীজাণু বেশী। যেদিকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকেরা বসে সেদিকে তো সে প্রাণান্তেও হাঁটিয়া যায় না। নিতান্ত দায়ে পড়িলে রাস্তার মাঝখান দিয়া নাকে কাপড় দিয়া চলিয়া যায়,—মোটর চাপা পড়িবার ভয় করে না।

পকেটে একটা ছোট সাবান সর্ব্বদাই রাখে। যখনই সুবিধা পায় তখনই একবার সমস্ত মুখ এবং কনুই পর্য্যন্ত হাত দুইটা বেশ করিয়া সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলে। ফলে, কালো মুখে কেমন একটা নীলাভ রং বাহির হইয়াছে।

এ হেন মনোহরের মুখপ্রক্ষালন যে একটা দেখিবার মতো ব্যাপার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রথমত বার দশেক আকাশের দিকে মুখ করিয়া ক্রমাগত কুলকুচা করে। তার পরে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত হাতটা গলার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া সেখানে পর্য্যন্ত যে সমস্ত বীজাণু গিয়াছে তাহা যেন টানিয়া বাহির করিয়া ফেলে। এই কার্য্যে তাহার পেট পিঠে গিয়া ঠেকে, চোখ কপালে ওঠে এবং মুখের রং বেগুনী হইয়া যায়। আর আশ্চর্য্য এক প্রকার শব্দ হয়। ভয় হয়, লোকটা এখনই শিরা ছিঁড়িয়া মারা না যায়। কিন্তু বীজাণুগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে তো!

আহার সম্বন্ধেও মনোহরের সতর্কতার অন্ত নাই। সকালে খায় গোটাকয়েক কাঁচা টমাটো এবং এক গ্লাস ইসবগুলের সরবৎ। কে একজন সম্ভবত পরিহাস করিয়াই বলিয়া গিয়াছে ওই সঙ্গে গোটাকয়েক কাঁচা পেঁয়াজ খাইবার জন্য। কাঁচা পেঁয়াজ খাইতে মনোহরের বমি আসে! দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। তবু খায়। বলে তো, ভালোই আছে। বাজারের খাবার সে প্রাণান্তেও স্পর্শ করিবে না। তবে মেসের ঢাকা দেওয়া শুকনা, ঠাণ্ডা ভাত তরকারীগুলা যে খায়, সে বোধ হয় নিতান্তই পেটের জ্বালায়, নিরুপায় হইয়া।

তা মনোহরের মনটি গঙ্গাজলের মতো সাদা। মেসের গোলমালের মধ্যে পারতপক্ষে সে মাথা গলায় না এবং নিজের দ্বারা কাহারও কোনো উপকারের সম্ভাবনা থাকিলে যথাসাধ্য চেষ্টাও

করে। কিন্তু কে জানিত সেই মনোহর যাওয়ার সময় সমস্ত এমন ভণ্ডুল করিয়া দিয়া যাইবে!

কিছুদিন হইতে তাহার ব্যবসা বেশ ভালোই চলিতেছে। কাজও বাড়িয়াছে, ব্যাঙ্কের ব্যালান্সও বাড়িয়াছে। এখন কোনো একটা বড় রাস্তার উপরে আফিস না করিলে চলে না। সেপ্টেম্বরের প্রথমে সে মেস ছাড়িয়া যাইবার নোটিশ দেয় এবং সেপ্টেম্বরে আফিসও খুলিয়া বসে। এমনিতেই তো মেসে কম সময় থাকিত, এখন মেসে আসা একেবারেই কমিয়া গেল।

এই সুযোগে গোলোক তাহার অনুমতি লইয়া তাহার ঘরখানি দখল করিয়া বসিল। ঘরে মনোহরের আসবাবপত্র বলিতে বিশেষ কিছুই ছিল না। একটা বহুকালের বিছানা এবং গোটা দুই ভাঙা সুটকেশ। জিনিষপত্র সম্বন্ধে মনোহর কোনো দিনই যত্নবান ছিল না। সেগুলা ফেলিয়া দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু বহুকালের জিনিস, মমতাবশে তাহার আফিসেই লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং গোলোককে তাহার ঘরখানি এক মাস আগেই দখল করিতে দিতে কোনো আপত্তির কারণ ছিল না।

এ ঘরখানিতে আসিয়া গোলোকের অনেক সুবিধা হইল। প্রথমত, এ ঘরের জানালা দিয়া ওদিকের বড়-বাড়ীর সেই বিশেষ জানালা চমৎকার দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, নিরিবিলি ঘর। দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই তাহাকে আর কেহ বিরক্ত করিতে পারিবে না।

তাহার সুবিধাই হইয়াছে, কিন্তু আপত্তি তুলিয়াছেন মুখুয্যে মহাশয়। তাঁহার ঘরে যত দিন একলা ছিলেন তত দিন বেশ

ছিলেন। কিন্তু তপন আসার পর হইতেই অসুবিধা বোধ করিতেছেন। মনোহর চলিয়া যাইতেই তাহার নিরিবিলি ঘরখানির উপর তাঁহার লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। পুরা সেপ্টেম্বর মাস ঘরখানি মনোহরের দখলেই ছিল। তাই চোখের সুমুখে গোলোককে ঘর দখল করিতে দেখিয়াও তিনি উচ্চবাচ্য করেন নাই। অক্টোবর পড়িতেই ধুয়া ধরিলেন, ওঘরে তিনি যাইবেন।

মেসের আইনমতে কোনো সিট্ খালি পড়িলে তাহার উপর সকলের চেয়ে পুরাতন মেম্বারের দাবী সর্ব্বাগ্রে এবং যে সকলের চেয়ে পরে আসে তাহার দাবী সর্ব্বশেষে। এই মেসে মুখুয্যে ও অবিনাশ আসিয়াছেন সকলের আগে। সুতরাং মুখুয্যের দাবীই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু গোলোক এ সকল কথা কানেও তোলে না। আফিসের সময় ঘর তালাবন্ধ করিয়া আফিস যায়। বাকী সময় ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে, কিম্বা কি যে করে কেহ জানে না। খাওয়ার সময় সুমুখে পাইয়া কেহ যদি কোনো কথা তোলে সে তার উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যায়।

গোলকের লম্বা চওড়া শরীর। জোর করিয়া কেহ তাহাকে বেদখল করিতে সাহস করে না। এবং মেসের আইনও কিছু গভর্ণমেণ্টের আইন নয় যে, তাহা মানিতে মানুষকে বাধ্য করা যাইতে পারে।

সুতরাং মেস না উঠিয়া উপায় কি ?

এই তো গেল প্রথম নম্বর।

দ্বিতীয় নম্বর বাধিয়াছে একটি ছোট ছেলেকে লইয়া। হেমেন্দ্রবাবু তাঁর ছোট ছেলেটিকে লইয়া থাকেন। ছেলেটির জন্য পৃথক কোনো সীট্ নাই। একই সীটে দুইজনে থাকেন। ছেলেটি স্কুলে নিম্ন-শ্রেণীতে পড়ে। দেশের স্কুলে পড়াশুনা ভালো হয় না বলিয়া তাহাকে এত অল্প বয়সেই এখানে লইয়া আসিয়াছেন। ছোট ছেলে মায়ের কাছ ছাড়া থাকিতে পারে না। রাত্রে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদে। রাত্রি দশটার আগে মেসে খাওয়া হয় না। প্রায়ই সে তাহার পূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়ে। তার পরে তাহার ঘুম ভাঙাইয়া খাওয়ানো,—সে হাঙ্গামা শুধু মায়েতেই পোহাইতে পারে। আফিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও হেমেন্দ্রবাবু এই সমস্ত হাঙ্গামা পোহান শুধু এই ভরসায় যে, সে একদিন বড় হইয়া বাপের দুঃখ দূর করিবে।

দু'জনে যে একটি সীটে থাকেন সেজন্য অবশ্য মেসের কেহ এখনও পর্য্যন্ত আপত্তি করে নাই। করিবার কোনো কারণও উপস্থিত হয় নাই। মেসে প্রায়ই সীট্ খালি থাকে না। কিন্তু সম্প্রতি মনোহরবাবু চলিয়া যাওয়ার পর হইতে একটি সীট্ খালি পড়িয়াছে। এখন কথা উঠিয়াছে যে, ছেলেটি অবশ্য ইচ্ছা করিলে বাপের কাছেই থাকিতে পারে। কিন্তু যত দিন না খালি সীটে লোক আসিতেছে তত দিন সেই সীটের ভাড়া হেমেন্দ্রবাবুকে দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে হেমেন্দ্রবাবু কোথায় একটা মেসের সন্ধান পাইয়া-

ছেন যেখানে ছেলেটির জন্য সীট্ ভাড়া তো লাগিবেই না, অধিকন্তু সেখানে ছোট ছেলেদের খাওয়ার জন্য অর্দ্ধেক চার্জ্জ লাগে। এই সন্ধান পাওয়ার পর হইতে হেমেন্দ্রবাবু বাঁকিয়া বসিয়াছেন। তিনি মনোহরবাবুর খালি সীটের ভাড়া তো দিবেনই না, বরং তাঁহার ছেলের খাওয়ার চার্জ্জ অর্দ্ধেক না করিলে আগামী মাস হইতে মেস ছাড়িয়া দিবেন নোটিশ দিয়াছেন।

এই গোলযোগে মেস দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অবিনাশবাবু, মুখুয্যে মহাশয় এবং আরও কয়েকজন হেমেন্দ্রবাবুকে সমর্থন করিয়াছেন। অন্য দল গোলোককে সমর্থন করিতেছে। গোলোক অবশ্য কাহারও সমর্থন প্রার্থনা করে নাই। সে তাহার দরজা বন্ধ করিয়া নিঃসঙ্গ বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার সমর্থনকারীরা বলিতেছে, গোলোক সমর্থন নাই বা চাহিল, সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে তাহারা উচিত কথা বলিবেই। এ জন্য তাহারা কাহাকেও ভয় করে না।

শীতকালের দিনে মিটিং বসানো মুস্কিল। সকালে তো উঠিতে না উঠিতেই স্নানাহারের বেলা হইয়া যায়। দুপুরে থাকে আফিস। সন্ধ্যা বেলায় কাহারও কাহারও ছেলে পড়ানো আছে। তাহারা থাকিতে পারে না। শনিবার সন্ধ্যায় এবং রবিবারে অনেকেই বাড়ী যায়।

অথচ এমন মুস্কিল যে, পয়লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে যা হয় একটা স্থির করিতেই হইবে। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া মেসের বাড়ী যাঁহাদের নামে ভাড়া আছে তাহারা পয়লা ডিসেম্বরেই বাড়ী

ওয়ালাকে নোটিশ দিয়া রাখিয়াছে। কি জানি, মেসের ব্যাপার! সাবধান হওয়া ভালো। শেষে বাড়ী ভাড়া তাহাদের নামে চাপিবে? তাহাদের দেখাদেখি মেসের আরও অনেকেই নোটিশ দিয়া রাখিয়াছে। মেস থাকে ভালোই, না থাকিলেও ক্ষতি নাই।

কয়েকজন ভদ্রলোক মেসের মিটিং বসাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কয়েক দিন মিটিং হইয়াও ছিল। অবশ্য সকলে উপস্থিত থাকিতে পারে নাই। কিন্তু যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা এমন আইনের কূটতর্ক আরম্ভ করে যে, শেষ পর্য্যন্ত গোলমালের মধ্যে মিটিং ভাঙিয়া যায়। কোনো বিষয়েই কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই।

মিটিঙের শেষে অবিনাশ একবার মুখুয্যেকে বলিয়াছিলেন,—তাহ'লে মেসটা ভেঙেই গেল। কি বল?

তেতালার ভালো ঘরটার জন্য মুখুয্যের এমনই জেদ চাপিয়া গিয়াছে যে, বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—ভাঙাই ভালো। বুঝলে না অবিনাশ?

১০

কিন্তু কয় দিন পরে এই মেসেই একটা সমারোহ পড়িয়া গেল।

বিয়ে নয়, পূজা নয়, নবকুমারের জন্মোৎসবও নয়, সমারোহ পড়িল মোহিতকে লইয়া। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাহার যকৃতটা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কয় দিন হইতে যকৃতের যন্ত্রণায় সে শয্যাশায়ী। অন্যান্য উপসর্গও না-কি আছে।

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, অবস্থা এমন কিছু গুরুতর নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী ভালো হইয়া যাইবে। মোহিত এই কয়েকটা দিনের জন্যও হাসপাতালে যাওয়ার কথা তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রথমত এমন শক্ত রোগ নয় যে হাসপাতালে জায়গা দিবে, দ্বিতীয়ত বিলাস এবং মেসের অন্যান্য সকলেই একবাক্যে বাধা দিল। ফলে, মোহিত মেসেই রহিয়া গেল।

অবিনাশবাবু বলিলেন,—রোগ-বালাই আর কার না হয়? কি বল মুখুয্যে? তাই ব'লে হাসপাতালে পাঠাতে হবে?

মুখুয্যে সায় দিয়া বলিলেন,—বটেই তো। তবে আর আমরা এতগুলো লোক আছি কি জন্যে? আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এই যে সবাই রয়েছি, একজন যদি আর একজনের অসময়ে না দেখে, কেউ কি বাঁচবে?

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—না, না। আমরা থাকতে হাসপাতালে পাঠানোর কথাই উঠতে পারে না। এখানে আর

যাই হোক, সেবাশুশ্রূষার অভাব হবে না। তার পরে ওর অদৃষ্ট আর ভগবানের দয়া।

বলিয়া যুক্তকরে একবার ভগবানকে প্রণাম জানাইলেন।

দাদু নাকের ডগায় চশমা দিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে হন্‌হন্‌ করিয়া তাঁহাদের পাশ দিয়া তেতালায় উঠিতেছিলেন।

মুখুয্যে টিপ্পনী কাটিয়া বলিলেন,—কি দাদু, দাবা খেলা হ'ল?

দাদু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ফোক্‌লা দাঁতে হাসিয়া বলিলেন,—একটু খেলছিলাম ভাই। কি জান, এমন একটা বদভ্যাস হয়েছে যে, একবাজি না খেললে কিছুতে থাকতে পারি না;—ওইটে, আর আফিং। ভাবলাম, যাই—একবার ছেলেটাকে দেখে আসি। আছে কেমন?

অবিনাশ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন,—ওই এক রকম আছে। এখন কথাটা কি জানেন, মোহিত হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

হাসপাতালের নামেই দাদুর মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—হবেই না তো!

—সেই কথাই হচ্ছিল। মুখুয্যেরও সেই মত, আমারও। আমরা বলছিলাম কি, ছোট ছোট ছেলেরা রয়েছে, ওদের গার্জেন বলতে আমরাই। আমরা থাকতে হাসপাতালে যাবে কোন দুঃখে? না কি বলেন?

দাদু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—বটেই তো!

মুখুয্যে হঠাৎ আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন,—আমি তো

বলি, যদি তেমন-তেমন কঠিন অবস্থাই হয়,—ওর বাপমাকে চিঠি লিখে দেওয়া হোক। তাঁরা আসুন। বৌমা আসতে চান, তিনিও আসতে পারেন। আমরা দরকার হ'লে গোটা তেতালাটা সে ক'টা দিনের জন্যে ছেড়েই দোব। কি বলেন ?

দাদু আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—নিশ্চয়।

অবিনাশ আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—অবশ্য তার দরকার হবে না। ডাক্তার তো বলছে···

বাধা দিয়া মুখুয্যে বলিলেন,—না, না। ভগবান করুন দরকার যেন হয় না। তবে যদি দরকার হয় সেই কথা বলছিলাম।

একটু থামিয়া বলিলেন,—আবার কি জান, চাকুরে মানুষ আমরা। সকলেরই দিনের বেলায় কাজকর্ম্ম আছে। এই দিনের বেলায় শুশ্রূষার কি যে হবে সেটাও ভেবে দেখবার। বুঝলে না অবিনাশ ?

কথাটা সত্য। অবিনাশ চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

দাদু চলিতেছিলেন, মোহিতকে দেখিয়া আসিবার জন্য। কিন্তু মধ্যপথে হাসপাতাল আর শুশ্রূষার ফন্দের কথা শুনিয়া তাঁহার পা দুইটা যেন মাটির মধ্যে বসিয়া গেল,—আর নড়িতে চাহিল না। তিনি উদ্বিগ্ন ভাবে একবার অবিনাশের, একবার মুখুয্যের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

তাঁহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছিল না। কোনোক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাঁচবে তো ?

অবিনাশ ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

দেখিতে দেখিতে শুশ্রূষা করিবার একটা তালিকাও প্রস্তুত হইয়া গেল। এ সকল বিষয়ে বিলাসই কর্ম্মকর্ত্তা। এমনিতেই তো সে ব্যস্তবাগীশ মানুষ। অকারণে যথেষ্ট হৈ চৈ করে। এখন একটা কাজের মতো কাজ পাইয়া মেস মাতাইয়া তুলিল।

দুম্ দুম্ করিয়া নীচে নামিয়া অবিনাশের হাতে তালিকাটি দিয়া বলিল,—দেখুন তো, হয়েছে কি না?

অবিনাশ, মুখুয্যে এবং দাদু তিনজনেই তালিকাটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলেন। চমৎকার হইয়াছে!

অবিনাশ তালিকাটি বিলাসের হাতে ফেরৎ দিয়া বলিলেন,—বেশ হয়েছে। কিন্তু এ হতভাগ্য দু'জনকে বাদ দিলে কেন? দাদু না হয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু আমরা তো আর সত্যিই তত বুড়ো হই নি। আমাদের দু'জনের নামও জুড়ে দাও। কি বল মুখুয্যে?

মুখুয্যে সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—নিশ্চয়ই। ওহে বিলাস, তোমাদের মতো ছেলেমানুষ অবশ্য নই। বরং বুড়োই বলতে হয়। কিন্তু একদিন এই বুড়ো মুখুয্যের নার্সিংএরই নামডাক ছিল। সে জানে অবিনাশ, আর দাদুও কিছু কিছু শুনেছেন নিশ্চয়।

দাদু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

মুখুয্যে বলিতে লাগিলেন,—একটি মাস সমানে রোগী নিয়ে কাটিয়েছি। দিনে আফিস ক'রেছি, আর রাত্রে সমস্ত রাত একটা জলচৌকির ওপর ঠায় বসে কাটিয়েছি। একটি দিন কেউ

ঢুলতে দেখে নি। ডাক্তার পর্য্যন্ত বলতে বাধ্য হ'য়েছিল যে, মুখুয্যে না থাকলে রোগী বাঁচানো কঠিন হ'ত। বুঝলে?

অবিনাশ সায় দিয়া বলিলেন,—বটে।

বিলাসের যে সেবা-শুশ্রূষা করা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা আছে তা নয়। সে নামিয়াছে শুধু উৎসাহের আধিক্যে। মুখুয্যের মতো আত্মসর্ব্বস্ব লোকও যে কোনো দিন পরের জন্য এমন করিয়া পরিশ্রম করিতে পারেন, তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাঁহার কথার ভঙ্গীতে বেশ বোঝা যাইতেছিল এ কথা মিথ্যাও নয়।

তাড়াতাড়ি বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তালিকার মধ্যে ধরা হয়েছে। তবে ঠিক আমাদের মধ্যে নয়,—রিজার্ভ রাখা হয়েছে। যখন দরকার পড়বে তখন নেওয়া হবে।

অবিনাশ বলিলেন,—কি মুস্কিল হবে জানো? এই দিনের বেলার নার্সিং। দিনে থাকছে কে? সবাই তো আফিসে যাবে।

বিলাস চিন্তিত ভাবে বলিল,—ঠিক ধরেছেন। একমাত্র তপন-বাবু ছাড়া আর কেউ মেসে থাকেন না। সেই তো হ'য়েছে মুস্কিল! তপনবাবু, এই দিকে আসুন।

তপন ঘরের মধ্যে বসিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। বিলাসের ডাকে উঠিয়া আসিল।

বিলাস তাহাকে বলিল,—আপনাকে কিন্তু প্রত্যহ দিনের বেলায় থাকতে হবে, বুঝলেন? রাত্রে আমরা।

তপন বাঁচিয়া গেল। রাত্রি জাগিতে সে মোটে পারে না। এক

রাত্রি জাগিলে সাত দিন শরীর খারাপ থাকে। তবু সমস্ত দিন রোগীর ঘরে কি করিয়া একা কাটাইবে ভাবিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

ভয়ে ভয়ে বলিল,—একা ?

বিলাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—একা মানে ? নীচে ঠাকুর-চাকর আছে। যখন দরকার হবে তখনই পাবেন। একা আবার কি!

আসল কথা রোগীর ঘরে থাকিতেই তপনের ভয়। রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিবে, ক্রমাগত চীৎকার করিবে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হইবে—এ দৃশ্য তপন দেখিতে পারে না।

তপন আবার বলিল,—কিন্তু মাঝে-মাঝে আমাকে আবার বেরুতেও হয় কি না।

বিলাস তপনের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতেছিল। রোগীর শুশ্রূষা করিতে গেলে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। তাহার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই স্বার্থত্যাগের ব্যাপার। এমন কি, সে ঠিকই করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রয়োজন বোধ করিলে এই সময় কয়েক দিনের ছুটি লইবে। আর বড়দিন পর্য্যন্ত যদি রোগ থাকে তাহা হইলে দেশেও যাইবে না।

কিন্তু মুখুয্যে ও অবিনাশের সে বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা রোগীকে বাঁচাইতে চান। এই জন্য যতটুকু স্বার্থত্যাগ নিতান্ত না করিলে নয় ততটুকুই করিতে প্রস্তুত।

অবিনাশ শান্ত ভাবে বলিলেন,—কাজ থাকলে বেরুবে না তো

কি করবে। কিন্তু সে তো দু'তিন ঘণ্টার জন্যে? ততটুকু ঠাকুর-চাকর ব'সে থাকবে। সব সময় যে তোমাকেই ব'সে থাকতে হবে তারই বা মানে কি?

ইহাও মেসের ব্যাপার। সকলে যা করিবে তাহাকেও তাহাই করিতে হইবে। তপনের আর নিস্তার নাই।

ইংরাজিতে রোগীকে বলে পেশেণ্ট। কিন্তু মোহিত ঠিক তাহার বিপরীত। সর্ব্বক্ষণ সে কাতরাইতেছে আর চীৎকার করিতেছে। এই বলিতেছে বমি করিবে;—যেই কেহ পিকদানীটা তাহার মুখের সামনে ধরিতেছে, অমনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিতেছে,—দূর, চাইলাম জল আর উনি মুখের সামনে ধরলেন পিকদানীটা। সব হ'য়েছে ছেলেখেলা!

রোগের যন্ত্রণায় সে যে কি করিবে দিশা পায় না।

কখনও আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, কখনও কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করে, কখনও বা এমন ভাষায় মেসের ভদ্রলোকদের গালাগালি করে, যে ভাষা চাকরের প্রতি প্রয়োগ করিতেও মানুষ দ্বিধা করে। আবার কখনও আপনার মনে অস্ফুট স্বরে 'মা মা' বলিয়া ডাকে, আর বালিশে মুখ গুঁজিয়া অবিশ্রান্ত গোঙায়। খানিক পরে হয় তো নিস্তেজের মতো পড়িয়া থাকে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই মেস! মোহিতের যে শুশ্রূষা ইহারা

করিতেছে তাহা দেখিয়া কে বিশ্বাস করিবে যে, ইহারাই একখণ্ড মাছের জন্য কলহ করে, সভা বসায়, প্রস্তাব পাশ করে।

আশ্বাসের কথা এই যে, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, রোগ কঠিন নয়। এ যাত্রা অল্পের উপর দিয়া কাটিয়া যাইবে। তবে ইহার পরেও যদি মোহিত মদ্যপান বন্ধ না করে তাহা হইলে কঠিন দাঁড়াইবে।

কথাটা মোহিতকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলা হয়।

মোহিত ডাক্তারের হাত দুটি ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে,—ডাক্তারবাবু, এ যাত্রা বাঁচিয়ে তুলুন। আর কখনও মদ ছোঁব না যদি ছুঁই তো গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত।

সে প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ডাক্তারও হাসেন, যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারাও হাসে।

সে যাহাই হউক, মোহিতের শুশ্রূষায় কোনো ত্রুটি নাই। মুখুয্যে এবং অবিনাশও সমানে ছেলেদের সঙ্গে রাত্রি জাগিতেছেন। মুখুয্যে মহাশয়ের শুশ্রূষা করিবার শক্তি দেখিয়া ছেলেরা অবাক হইয়া গিয়াছে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ এমন সুশৃঙ্খলে সেবা করিতে পারে না। এমন কি গোলোকের মতো লোকও যথারীতি রোগীর শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছে।

এইরূপ সময়ে ভুবনদাদা একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার পর হইতে তিনি প্রতি শনিবার নিয়মিত ভাবে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। সকলে আশা করিয়াছিল, এ শনিবার নিশ্চয়ই তাহার ব্যতিক্রম হইবে। এতগুলি লোকের

মধ্যে একজন চলিয়া গেলে যে শুশ্রূষার কোনো বিঘ্ন হইবে তাহা নয়। তবু মেস বলিয়া কথা। এখানে সব কাজে ভাগের ভাগ হওয়া চাই।

কয় দিন হইতে ভুবনবাবু নিজেও বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, এ শনিবার তিনি কোথাও যাইবেন না। কিন্তু শনিবার সকাল হইতেই হুঁকাটি হাতে করিয়া দাদুর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্প্রতি দাদু ছাড়া এ মেসের আর সকলই রোগী লইয়া ব্যস্ত।

দাদুরও এ কয় দিন দাবা খেলার বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। তাঁহার সঙ্গীটি শুশ্রূষায় ব্যস্ত। দাদু তাঁহার ঘরে বসিয়া নিজে নিজেই ছকটা পাতিয়া একটা চাল দেখিতেছিলেন। ভুবনবাবুকে দেখিয়া বলিলেন,—

—কি হে, তোমার খবর কি?

ভুবনবাবু কাছে বসিয়া বলিলেন,—কি করছেন? একা-একাই না কি?

দাদু চশমাটা নাকের ডগায় আনিয়া বলিলেন,—কি আর করা যায়! তার পর?

হুঁকাটা দাদুর হাতে দিয়া মুখুয্যে বলিলেন,—একটা ভারী মুস্কিলে পড়েছি। কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

দাদু টান বন্ধ রাখিয়া সকৌতুকে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। ভিতরে ভিতরে তিনিও রসিক কম নন।

ভুবনবাবু কাহারও পানে না চাহিয়া যেন দেওয়ালটাকে বলিতে

লাগিলেন,—অথচ কি যে করি! মোহিতের অমন অসুখ, যাওয়াও উচিত নয়। ভারী মুস্কিল।

দাদু জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বপ্নটা কি রকম? খারাপ কিছু?

ভুবন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—খারাপ মানে ভালো নয় আর কি। মানে আপনার বৌমার সম্বন্ধে। দেখলাম যেন জ্বর হয়েছে। মানে শুয়ে রয়েছে একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে ঠিক যেন রোগীর মতো।

দাদু উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন,—তাহ'লে তোমার একবার যাওয়া উচিত।

—উচিত?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু মোহিতের অসুখ। যাওয়াটা কি···

দাদু ডান হাতটা নাড়িয়া বলিলেন,—তাতে কি হ'য়েছে! আরও তো লোক রয়েছে। এখানকার জন্যে ভেবো না, কিন্তু ওখানে তুমি না গেলে দেখবে কে?

ভুবন এবারে দাদুর আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন,—আমিও তাই ভাবছিলাম, যাওয়াই উচিত। কেবল মোহিতের জন্যে···তাহ'লে যাওয়াই উচিত, কি বলেন?

দাদু আর একবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—নিশ্চয়ই।

ভুবনের ইচ্ছা ছিল কাজটা চুপি চুপি সারিয়া ফেলেন। কিন্তু কতকগুলি ছেলের জন্য তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। সাজ পোষাক করিয়া নামিয়া আসিতেই একেবারে তাহাদের সুমুখে

পড়িয়া গেলেন। ছেলেরাও তৈরী। তাঁহার পোষাক দেখিয়াই তাহাদের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহারা সমস্বরে হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সেখানে লোক জমিয়া গেল। সিল্কের পাঞ্জাবী, জরিপাড় চাদর, আর কোঁচানো শান্তিপুরের ধুতি-শোভিত ভুবন তাহাদের সুমুখে দাঁড়াইয়া অপ্রস্তুত ভাবে হাসিতে লাগিলেন।

১১

সুরেন্দ্রবাবুর যে তপনকে পছন্দ হইয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সময় পাইলে এখন তিনি তপনের সঙ্গে মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এখন আর তপনকে তিনি মাষ্টার মশাই বলেন না, নাম ধরিয়াই ডাকেন এবং 'তুমি' বলেন। তপন অবশ্য ছেলে ভালোই। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুদের আমলে ভালো ছেলেরাও পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে বড় বেশী খোঁজ রাখিত না। তিনি নানা বিষয়ে তপনের জ্ঞানের সম্পূর্ণতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।

শ্যামলীর এবং তপনের মনোভাব ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু এখন আর একজন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া পড়া বুঝাইয়া যায় না এবং আর একজনও নতমুখে নিঃশব্দে পড়া শুনিয়া যায় না। তপন এখন প্রায়ই নানা বিষয়ে শ্যামলীকে প্রশ্ন করে এবং শ্যামলীও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যথাসাধ্য উত্তর দেয়। উত্তর দিতে না পারিলে তপন সস্নেহে শ্লেষও করে। শ্যামলী তাহার আর জবাব দেয় না,—টিপিয়া টিপিয়া হাসে। কথনও কথনও মৃদুস্বরে এক আধটা জবাবও দেয়।

মোট কথা, উভয়ের মধ্যে এখন আর কোথাও জড়তা নাই। পরস্পরের মধ্যে যে বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছে তাহাও দুজনেই জানিতে পারিয়াছে। অথচ জানিতে যে পারিয়াছে তাহা দুজনের

কথায়, বার্ত্তায়, ভাবে, ভঙ্গীতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তবু বোঝা যায়। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বোঝা যায়, তপন আর ঠিক মাহিনা-করা গৃহ-শিক্ষকের মতো আড়ষ্ট ভাবে যাওয়া-আসা করে না। মাসের শেষে হাত পাতিয়া মাহিনা অবশ্য লয়। কিন্তু তাহাতে কুণ্ঠা অনুভব করে না। তাহার টাকার প্রয়োজন তাই টাকা লইতেছে, কিন্তু শ্যামলীকে যে পড়ায় সে এই কয়টা টাকার জন্য নয়,—নিজের গরজে। এবং শ্যামলীও এই কয় দিনের মধ্যে পড়াশুনার অসারতা উপলব্ধি করিয়া পড়ায় ঢিলা দিয়াছে। বীজগণিতের দুরূহ অঙ্ক কষার চেয়ে নানা দেশের গল্প শুনিতেই তাহার বেশী ভালো লাগে। লুকাইয়া লুকাইয়া নভেলও পড়ে।

নভেল পড়ার কথা তপন জানে না। সে দেখে, তাহার অপর দুইটি অপোগণ্ড ছাত্রের মতো এই মেয়েটিও ক্রমেই পড়াশুনার চেয়ে সময়হরণের প্রতি বেশী মনোযোগী হইতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, সময়হরণের প্রক্রিয়াগুলিও সকলেরই হুবহু এক। আসামাত্রই শ্যামলী নিজের হাতে তাহার জন্য খাবার লইয়া আসে।

অন্য দুইটি ছাত্রকে তপন কিছু বলিতে সাহস করে না। কিন্তু শ্যামলীর উপর তাহার যেন জোর আছে।

হাসিয়া বলে,—বাঃ! এইবার ঠিক হয়েছে! আধ ঘণ্টা কাট্‌বে খাবার খেতে তার পর চা আনতে, খেতে আর আধ ঘণ্টা। এর পরে পাণ আছে, সেও আনতে নিতে আর আধ ঘণ্টা। সব

শেষে বইগুলো খুঁজতেই বাকী আধ ঘণ্টা কেটে যাবে। এমন না হ'লে পড়িয়ে আরাম আছে!

শ্যামলী রাগিয়া যায়। হাতের কাছে যে বইখানি পায় মুখের সামনে খুলিয়া ধরিয়া বলে,—বেশ।

তপন খাবার খাইতে খাইতে বলে,—সুরেনবাবুকে বলতে হবে, তাঁর মেয়ে এবার আর জলপানি না নিয়ে যায় না।

শ্যামলী রাগিয়া বলে,—চাই নে জলপানি।

তপন সকৌতুকে তাহার পানে চায়। বলে,—কিন্তু আমাকে এ সব খাইয়ে তো লাভ নেই। বরং পরীক্ষায় যারা নম্বর দেবে তাদের ডেকে ডেকে খাওয়াও।

শ্যামলী ভীষণ রাগিয়া যায়। ভ্রূকুটি করিয়া বলে,—খাওয়াবো তো ডেকে ডেকে।

ভ্রূকুটি দেখিয়া তপনের ভারী আমোদ বোধ হয়। হাসিয়া বলে,—তুমি তো যেতে পারবে না। বরং আমাকে তাদের ঠিকানা দাও, আমি কাল সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসব।

শ্যামলী এর পর হাসিয়া ফেলে। তর্জ্জন করিয়া বলে,—বেশ, বেশ। আপনাকে আর খেতে হবে না। পড়াতে এসেছেন, পড়ান।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। গ্লাসের জলে হাত ধুইয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—তবে থাক। আর খাব না। কিন্তু পাণ তো আনতে হবে? নইলে আর আধ ঘণ্টা কাটাবে কি ক'রে?

শ্যামলী গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল। বলিল,—জানি না।

তপনের ভারী কৌতুক বোধ হইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—অঙ্কগুলো হয়েছে ?

—না।

—ট্রান্‌স্লেশান্‌ ?

—না।

—যে রচনাটা লিখতে দিয়েছিলাম সেটা ?

—না।

—জ্যামিতির এক্সট্রাগুলোও হয় নি নিশ্চয়ই ?

—না।

তপন খুশী হইয়া বলিল,—বেশ, বেশ। শ্যামলী বড় ভালো মেয়ে।

শ্যামলী অপাঙ্গে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়াই তপনের শূন্য রেকাবী ও জলের গ্লাসটা লইয়া বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল মিনিট দশেক পরে। তখন তাহার মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। পাণের ডিবাটা ঠক্‌ করিয়া রাখিয়া সে নিজের আসনে বসিল।

শ্যামলীর ছোট ভাই পল্টু পাশেই একটা শোফায় বসিয়া একখানি ছবির বই উল্‌টাইতেছিল। অনেকক্ষণ হইতেই সে দিদির বিপদ দেখিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সহানুভূতির আরও একটু কারণ ছিল। শ্যামলী তাহাকে আজ বায়োস্কোপ দেখাইবার ভরসা দিয়াছে। সেই

আশাতেই সে সাজিয়া গুজিয়া অনেকক্ষণ হইতে এ ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার বিশ্বাস পড়ানোটা শেষ হইলেই তাহারা বায়োস্কোপ দেখিতে যাইতে পারিবে।

সে বলিল,—দিদির দুপুর থেকে ভয়ানক মাথা ধরেছে যে।

তপন যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল। ব্যস্তভাবে বলিল—মাথা ধরেছে? তা এতক্ষণ বল নি কেন?

শ্যামলী কোন জবাব দিল না। তাহার মাথাটা একেবারে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

তপন স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—মাথা কি খুব বেশী ধরেছে? তা বললেই তো হ'ত। তাহ'লে কি আর…

শ্যামলী আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না দেখিয়া তপন বিব্রত হইয়া উঠিল। কি যে বলিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কেবল বোকার মতো শ্যামলীর আর পল্টুর দিকে চাহিতে লাগিল।

দিদির কান্না দেখিয়া পল্টু সোফা হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিজ্ঞের মতো বলিতে লাগিল,—দিদির দুপুর বেলায় ভয়ানক মাথা ধরেছিল। এখন অনেকটা ভালো আছে। মা আজকে পড়তে মানা করেছে কি না, তাই পড়তে পায় নি। মা বলে, প'ড়ে প'ড়ে দিদির মাথা ব্যথা হ'য়েছে। জানেন মাষ্টার মশাই, দিদি বলেছে আজকে আমরা বায়োস্কোপে যাব।

পল্‌টুর কথাগুলি তপনের কাণে তিরস্কারের মতো বাজিতেছিল। শ্যামলীকে অকারণ ভৎ´সনা করার জন্য মনে মনে সে অনুতপ্তও হইতেছিল।

তাড়াতাড়ি বলিল,—বেশ তো, তাই যাও না তাহ'লে।

পল্‌টু উল্লাসে লাফাইয়া দিদির একখানি হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

—চল না দিদি। সময় তো হ'য়ে এসেছে। ওঠো!

শ্যামলী চোখের জল মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। বরং ট্রান্‌স্লেশানের বইখানি খুলিয়া খাতা পেন্সিল লইয়া বসিল।

তপন বিরক্ত ভাবে বলিল,—আবার লিখতে বসলে যে! বায়োস্কোপে যেতে হবে না?

এবারে শ্যামলীও ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল,—যাব কি করে? বাবা এখনও আফিস থেকে ফিরেছেন না কি?

তপন আর কথা কহিল না। কিন্তু পল্‌টু তাহার হাত দুটি ধরিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল,—বাবা এক্ষুনি এসে পড়বেন দিদি। তুমি ততক্ষণ কাপড়টা ছেড়ে নাও না। তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব। ওঠো না! ওঠো!

শ্যামলী খাতার উপর লিখিতে লিখিতে বলিল,—বাবা আসুন, তার পর।

কিন্তু তাহার কথা আর শেষ হইতে পাইল না। দ্বারের কাছে একখানা মোটর আসিয়া থামিতেই পল্‌টু চীৎকার করিয়া

উঠিল,—ওই বাবা এলেন! দিদি, তুমি শীগ্‌গির তৈরী হ'য়ে নাও।

বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

মধ্যপথেই সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতে আসিতে বলিলেন,—কি ব্যাপার? ছুট্‌ছিস্‌ কোথায়?

পল্টু হাঁফাইতে হাঁফাইতে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, —জানো বাবা, আজকে আমরা বায়োস্কোপ যাব ঠিক করেছি। কেবল তোমার জন্যেই যত দেরী।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন,—আমার জন্যে দেরী? কেন বল্‌ দেখি?

—নইলে আমাদের নিয়ে যাবে কে? আর টাকাই বা কে দেবে, বল?

—তা বটে। কিন্তু টাকা না হয় আমি দিলাম, নিয়ে তো যেতে পারব না।

ছেলে কিন্তু জেদ ধরিয়া বসিল, লইয়া যাইতেই হইবে। সুরেন্দ্রবাবু অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না। অবশেষে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি তপনকে ব'লে দিচ্ছি। সে বরং তোদের নিয়ে যাবে। কেমন?

কিন্তু পল্টু মাষ্টার মহাশয়ের উপর ভরসা করিতে পারিল না। কহিল,—না, তুমি চল। মাষ্টার মশাই যাবেন না।

সুরেন্দ্রবাবু বিব্রত ভাবে বলিলেন,—যাবে, যাবে। আমি ব'লে দিচ্ছি।

বলিয়া শ্যামলীর পড়িবার ঘরে আসিয়া তপনকে বলিলেন,—ওহে, তোমার কি এখন কোনো কাজ আছে?

—না, বিশেষ কিছু নেই।

—তাহ'লে তুমি এদের নিয়ে গিয়ে বায়োস্কোপটা দেখিয়ে নিয়ে এস তো! আর দেখ, আমাদের আফিসে একটা কাজ খালি হচ্ছে। আচ্ছা, সে ফিরে এসে হবে বরং। আমি একটা দরখাস্তের খসড়া ক'রে এনেছি। একটা সই ক'রে দেবে। শ্যামলী, তুমি তৈরী হ'য়ে নাও মা। আমি তো যেতে পারব না। তবে যাওয়ার পথে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাব। কি বল?

বায়োস্কোপ সম্বন্ধে তপনের স্পৃহা কোনো দিনই বেশী নয়। কিন্তু হঠাৎ চাকুরীর সম্ভাবনার কথা শুনিয়া তাহার মন এমন খুশী হইয়া উঠিল যে, সেও উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্যামলীকে বলিল,—যাও, আর দেরী কোরো না। ও-সব কাল হবে।

শ্যামলী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

শ্যামলীর মনে ভয় ছিল, তাহার মা কখনই তপনের সঙ্গে তাহাকে বায়োস্কোপে পাঠাইতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তিনি একটা কথাও কহিলেন না।

পল্টু বরং যাওয়ার সময় উল্লাসভরে বলিল,—আমরা বায়োস্কোপে যাচ্ছি মা।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

মা একবার সুসজ্জিতা কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু তাহাকে সুরেন্দ্রবাবু পিছনে পিছনে নামিতে দেখিয়া বুঝিতেই পারিলেন না যে, তপন আজ তাহাদের লইয়া যাইতেছে।

শ্যামলীর কিন্তু সে চাহনি দেখিয়া বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। নির্ব্বিঘ্নে নীচে নামিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তপন বসিয়া বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। এত দিনে নিশ্চয় দুর্গ্রহ কাটিল। কি চাকুরী, কত বেতন, কিছুই অবশ্য জানা হইল না। তবে সুরেন্দ্রবাবু নিজে যখন চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাহার নিজেরও যোগ্যতা কম নয়, তখন আশা করা যায় চাকুরী নিতান্ত কম মাহিনার হইবে না। বিশেষ,—তপন মনে মনে হাসিল,—এ চেষ্টা তো অপরিচিত তপনের জন্য নয়, ভাবী জামাতার জন্য।

ঠিক এমন সময়ে শ্যামলী নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তাহার পরনে একখানি ফিকা বাসন্তী রঙের ছাপা সিল্কের শাড়ী, গায়ে সিন্দূরের মতো টক্‌টকে লাল রঙের বডিস্। তাহার

দিকে চাহিয়া তপনের এই প্রথম মনে হইল, শ্যামলী দেখিতে তো মন্দ নয়! হাঁ, তাহাকে সুন্দরীই বলা চলে।

শ্যামলী হাসিয়া বলিল,—উঠুন!

তপন অকারণেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হ্যাঁ, চল।

জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখিলে পল্টুর আনন্দের সীমা থাকে না। অন্য ছবি সে বুঝিতেও পারে না, দেখিতে ভালোও বাসে না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহ বাঘ হাঁ করিয়া যখন আগাইয়া আসে, তাহার ভয় হয়, এখনই তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল বুঝি! ভয়ে সে দিদিকে জড়াইয়া ধরে।

শ্যামলী হাসিয়া ওঠে। তপনকে ডাকিয়া বলে,—পল্টুর কাণ্ডটা দেখুন।

তপনও তাহার কাণ্ড দেখিয়া হাসে। কিন্তু পল্টুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে তখন সম্মুখের দুইজন দর্শকের মাথার ফাঁক দিয়া আড়ে-আড়ে দেখিতেছে, সিংহটা কতদূর অগ্রসর হইল।

যখন আসল ঘটনা আরম্ভ হয়, তপন এবং শ্যামলী দুইজনেই নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। একটি অর্দ্ধনগ্ন নারীর প্রেমের কাহিনী। তপনের মনে হয়, শ্যামলীর মতো একটি ছোট মেয়েকে এই দৃশ্য দেখিতে লইয়া আসা ঠিক হয় নাই। আর শ্যামলী এই ভাবিয়া

দুঃখিত হয় যে, তপন তাহাকে নিতান্তই ছেলেমানুষ বলিয়া মনে করে। অথচ মেয়েমানুষের পনেরো বছর বয়স কি কম!

মাঝে মাঝে পল্টু একটা কাণ্ড করিয়া বসে। হয় তো অসভ্য আফ্রিকার মেয়েরা নৃত্য করিতেছে, দেহের উপরার্দ্ধ ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত হইতেছে, কিম্বা হয় তো কোনো শ্বেতাঙ্গিনী পুরুষের দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতেছে,—পল্টু কি বোঝে সেই জানে, অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। সে হাসির মধ্যে কোথাও বোধ হয় সংক্রামকতা আছে। দেখিতে দেখিতে সামনে পিছনে চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে। অনেকক্ষণ সংযত থাকিবার চেষ্টা করিয়াও অবশেষে তপন এবং শ্যামলীও হাসিয়া ওঠে।

শ্যামলী পল্টুকে টিপিয়া ইঙ্গিতে হাসিতে নিষেধ করে। কিন্তু আট-নয়-বৎসরের শিশু কি জানে, এ-সকল দৃশ্য নিঃশব্দে উপভোগ করিবার, হাসিতে নাই? তাহার হাসি থামিবে কেন?

তপন অপাঙ্গে চাহিয়া দেখে, একটি সুন্দর লজ্জায় শ্যামলীর গাল দুটি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হয়, শ্যামলীকে যত ছোট সে ভাবিয়াছিল তত ছোট সে নয়। তাহার হাসির সঙ্গে পল্টুর হাসির অনেক তফাৎ। দেখিতে দেখিতে শ্যামলীর ব্রীড়াসুন্দর হাসি তপনের মনের উপর ধীরে ধীরে বিচিত্র রঙের ছায়া বিস্তার করে।

১২

সেদিনটা ছিল কি একটা ছুটির দিন। যাহাদের ছেলে-পড়ানো আছে তাহারাও আর বাহির হয় নাই। আবার মাসের শেষের দিকে ছুটি,—অর্থাভাবে বাবুদের বাড়ী যাওয়ারও অসুবিধা আছে। সুতরাং বিলাসের ঘরে বেশ বড় রকমের একটা আড্ডা বসিয়াছে। এতগুলি লোকের বিচিত্র সমাবেশ বড় একটা হয় না।

একটু আগে তাস এবং দাবা চলিতেছিল। কিন্তু ছুটির দিনে বাড়ী যাইতে না পারার দুঃখে খেলা জমে নাই। সেই কথাই হইতেছিল।

উমেশের দেহটি শীর্ণ বটে, কিন্তু ঝাঁঝ বেশী। সে তো চিঁ চিঁ করিয়া চেঁচাইয়া পঞ্জিকাকারদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িল। ছুটি পড়িল কি না মাসের শেষের দিকে? যে সময় বাবুদের হাতে টাকা থাকে না? এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

সুনীল সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে। সে বলিল,—বাপু, সবই তো তোমাদের বাজে। কাজের থেকে ছুটি পাওয়া যায় ব'লেই না পর্ব্বদিনের অত সম্মান! সেই ছুটিই যদি না কাজে লাগল তো কিসের পর্ব্ব!

বঙ্কু এখনও পর্য্যন্ত এসরাজের কাছ হইতে একটা গৎ আদায় করিবার জন্য বড় টানাটানি করিতেছিল। কিন্তু এসরাজটা নিতান্তই একরোখা,—ছড়ের ঘায়ে কেবলই আর্ত্তনাদ

করিতেছিল। অবশেষে হতাশ হইয়া বঙ্কু এসরাজটা কোণে রাখিয়া দিল।

বলিল,—বাবা, দিবি তো একটা দিন ছুটি। তা দিনকয়েক পিছিয়ে আসছে মাসের গোড়ার দিকে ফেললেই তো হ'ত।

উমেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল,—আর ছুটি দিতে হয় তো সোমবারে। শনিবারে যাব, একেবারে দু'টি দিন ছুটি সেরে মঙ্গলবার ফিরব। তবে না ছুটি! তা না তো···

উমেশ মুখটা বিকৃত করিল।

বঙ্কু কি যেন ভাবিতেছিল। বলিল,—নাঃ! বাসা না করলে আর চলছে না। আসছে বছরে মাইনেটা তো বাড়ুক, তার পরে বাসা ক'রে তবে অন্য কাজ!

বলিয়া অন্যমনস্কভাবে এসরাজটা আবার কোলের উপর তুলিয়া লইল।

সুনীল মেঝেয় একটা চাপড় দিয়া বলিল,—কে বললে বাসা হয় না? তুমি যা মাইনে পাও সে মাইনে যদি আমি পেতাম তো কোন দিন বাসা ক'রে ফেলতাম। তুমি একটা কঞ্জুসের হদ্দ!

বঙ্কু পঞ্চান্ন টাকা মাহিনা পায়। সুনীলের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল,—পাগল!

সুনীল উত্তেজিত ভাবে বলিল,—পাগল মানে! তুমি থাকতে চাও তো বল।

উমেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল,—পঞ্চান্ন টাকায় তো তোফা বৌ নিয়ে থাকা যায়।

বন্ধু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল,—কি রকম?

উমেশ রকমটা কি প্রকার তাহা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সুনীল তাহাকে বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—আমার কাছে শোনো। আমার একটি ভায়রাভাই থাকে বীডন ষ্ট্রীটের ওদিকে। অবশ্য একটু গলির ভেতর ভাই, তা ব'লে দিচ্ছি। তেতালার ওপর একখানি ঘর, সামনে একটুখানি ছাদ, তারই এক পাশে টবের কাঠের ঘের দিয়ে দিব্যি একখানা রান্নাঘর তৈরী ক'রে দিয়েছে;—পনেরো টাকা ভাড়া। আর শুন্‌বে?

বন্ধুর উৎসাহ যেন উদ্দীপ্ত হইয়াও হইতেছিল না। বলিল,—পায়খানা?

সুনীল গম্ভীরভাবে বলিল,—পায়খানা দোতালায়।

—দোতালায় লোক থাকে না?

—থাকবে না কেন? সেখানেও আর দুই ভদ্রলোক এক একখানা ক'রে ঘর নিয়ে থাকে। লোক তো বেশী নয়, একটা পায়খানায় দিব্যি চ'লে যায়।

—জল?

উমেশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া ছিল। জলের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। রোগা মানুষ, একটুতেই দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে।

কহিল,—জল পাম্প ক'রে ওপরে তুলে দেয়! শুন্‌ছ পনেরো টাকা ভাড়া। না, জল?

বন্ধু উহারই মধ্যে একটু বাবু মানুষ। কাপড়ে সাবান দিতে

পারে না বলিয়া ডাঙ্গৈংক্লিনিঙে দেয়। সেজন্য মেসের টিট্‌কারীও কম সহিতে হয় না।

বন্ধু বিষণ্ণ ভাবে কহিল,—সেই তো হ'ল হে! এক-তালা থেকে তেতালায় জল নিয়ে আসাও তো বড় কম কথা নয়!

উমেশ রাগিয়াই ছিল। বলিল,—কে বলছে তোমায় বাসা করতে? দু'শো টাকা মাইনে না হ'লে তুমি বাসা ক'র না হে! সুনীলেরও যেমন কাজ নেই!

বলিয়া পচ্ করিয়া বাহিরে খানিকটা থুথু ফেলিল।

সুনীল রাগে নাই। হাসিয়া বলিল,—এ দিকে চেহারা যা হ'য়েছে তাতে তিনটে শেয়ালে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। বাসা করার সুখটুকু আছে, আর সকালে-বিকেলে তিন বাল্‌তি ক'রে জল তুলে দিতে পারবে না? ননীর পুতুল!

উমেশ সক্রোধে বলিল,—আরে, তুমিও যেমন! দু'শো টাকা মাইনে না হ'লে উনি বাসা করতে পারেন?

বিলাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। হাসিয়া বলিল,—তবেই হ'য়েছে! সে শুভদিন যদি কখনও আসেই তখন আর বৃদ্ধ বয়সে বাসা করার প্রয়োজন হবে না।

উমেশ বলিল,—আরে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। মেসের ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে আর চল্লিশ পার হ'তে হবে না। তার আগেই পটল তুলব। ও কি কোনো কালে বাসা করবে ভেবেছ? এই মেসে

মাটি কামড়ে পড়ে থেকে মেয়ের বিয়ের টাকা জমাবে। মানুষ দেখে চিনতে পারো না ?

এমন সময় তপন আসিয়া উপস্থিত হইল। বায়োস্কোপ দেখিয়া শ্যামলীদের পৌঁছাইয়া দিয়া এই ফিরিল। সুরেন্দ্রবাবু আবেদন-পত্রটির খসড়াও টাইপ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানেও একটা সই দিয়া আসিয়াছে। সেখান হইতে সোজা এই বিলাসের ঘরে। দোতালায় আসিতেই তাহার কানে ইহাদের কলরব পৌঁছে। সে আর ঘরে ঢোকে নাই। সটান এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে তাহার মুখের চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে।

মাদুরের এক প্রান্তে বসিয়া বলিল,—কি ব্যাপার!

বিলাস হাসিয়া বলিল,—ব্যাপার গুরুতর। বন্ধু বাসা করছে!

—তাই নাকি ?

উমেশের রাগ তখনও যায় নাই। বলিল,—হ্যাঁ, মিডল্ স্ট্রীটে বাসা নেওয়া হয়েছে।

বিলাস একটা কথা ঠিক বলিয়াছিল। দুই শত টাকার অপেক্ষা করিতে গেলে সাধারণ কেরাণীর আর এ জীবনে বাসা করা ঘটিয়া উঠিবে না। পৃথিবীর সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরালায় দুটি প্রাণীতে ঘর বাঁধিবার এই সময়। এর পরে ঘর-বাঁধা

হয় তো হইবে; কিন্তু চোখের কোণে এই যে স্বপ্ন, এই যে আনন্দ মনের পাত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া আপন ঐশ্বর্য্যে টলমল করিতেছে, এ স্বপ্নও তখন থাকিবে না, এ আনন্দও না। সেই অবেলায় না থাকিবে এমন আনন্দ উপভোগের শক্তি, না থাকিবে দুঃখ সহিবার মতো ঔদাস্য।

এই সময়। কোথাও একটা অখ্যাত সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে জরাজীর্ণ একখানি বাড়ীর ওই প্রায়ান্ধকার একটি কক্ষই ভাড়া লইতে হইবে। সহিতে হইবে সকালে উঠিয়া একতলা হইতে তেতালায় তিন বালতি জল তুলিয়া দেওয়ার কষ্ট। তার পরে গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাজার যাওয়া। তার পরে আফিস। ফিরিবার পথে দুই চারিটা টুকিটাকি জিনিস কেনা। আবার বিকালে—আফিস হইতে আসিয়াই জল তোলা। যদি কখনও স্ত্রীর অসুখ করে, নিজেই উনান ধরাইয়া দুটা ভাতে-ভাত নামাইয়া ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতে হইবে। দরকার হইলে নিজের হাতে বাসনও মাজিতে হইবে।

অনেক দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখ যেন গায়ে লাগে না। এত দুঃখ সহিয়াই এই কলিকাতা শহরে বহু লোক পরমানন্দে বাসা করিয়া আছে। পরমানন্দে বই কি! সাধ করিয়া কি আর কেহ দুঃখ সহে?

উমেশ ও সুনীলের রাগ দেখিয়া বিলাস মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে বলিল,—দেখ ভাই, আমি অবশ্য নিতান্তই অর্ব্বাচীন। এ ব্যাপারে কথা বলার অধিকারও নেই। কিন্তু, রাগ কোরো না,

যতীনবাবুর বাসার অভিজ্ঞতা যা শুনেছি তার পরে আর কাউকে বাসা করতে পরামর্শ দিতে পারি না।

সুনীল এবং উমেশ দুইজনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—কি শুনেছ? কি শুনেছ?

বিলাস তেমনি ভাবে হাসিয়া বলিল, সে তার কাছেই একদিন শুনো। মোট কথা, পরমানন্দে তারা কিছুদিন ছিল বটে, কিন্তু অভাব যতই বাড়তে লাগল, খিটি-মিটিও তেমনি বাড়তে লাগল। শেষে বাসা উঠিয়ে দিয়ে আবার এই মেসেই আসতে হ'ল। শুনেছ তো সবই।

উমেশ চেঁচাইয়া বলিল,—যতীন একটা রাস্কেল। বুঝলে? একটা রাস্কেল। তার কাহিনী আমার কাছ থেকে শুনো একদিন।

সুনীল হাতের তালু উল্টাইয়া বলিল,—কি জানি ভাই, কিন্তু আমার ভায়রাভাই তো তোফা আছে। যেমনি আনন্দে আছে, তেমনি নধর শরীরটিও হ'য়েছে। থাকেও দিনরাত্রি বাড়ীর ভেতরে। বিশেষ দরকার না পড়লে বাইরে বেরোয় না।

সকল কথা শুনিয়া বঙ্কু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কহিল,—ভাই, বাসা করার লোভ যে আমার নেই তা নয়। সেজন্যে কিছু কিছু দুঃখ সইতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু বাঙালীর ছেলে,—শুধু বৌটিকে নিয়েই তো আমার সংসার নয়। বুড়ো বাপ-মা আছেন, নাবালক ভায়েরা আছে, বিবাহ-যোগ্যা বোন আছে,—এমন কি, যাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে সে সব বোনেরও কিছু কিছু ঝক্কি বইতে

হয়। সামান্য মাইনের কেরাণীর পক্ষে এ বোঝা তো কম নয়। এ ফেলাও যায় না, ফেলা উচিতও নয়। বুঝলে ?

বন্ধু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

উমেশ চেঁচাইয়া বলিল,—ভাই-বোন আর কার সংসারে নেই ? তাই ব'লে চিরদিন মেসে কাটাতে হবে ?

বন্ধু হাসিয়া বলিল,—হয় তো তাই হবে। আমাদের বড়বাবু বুড়ো হয়ে অবসর নিতে যাচ্ছেন, তাঁর আর বাসা করাই হ'ল না। দুটি ভাই চিরদিন বাড়ীতে ব'সেই কাটালে। নিজের সংসার তো আছেই, তার ওপর তাদের সংসার। ভদ্রলোক চারশো টাকা মাইনে পান, কিন্তু সমস্ত জীবনটা মেসেই কাটল।

উমেশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—তাহ'লে তাঁর বিয়ে করাই উচিত হয় নি।

বন্ধু হাসিয়া বলিল,—হয় তো হয় নি। কিন্তু বাঙালীর ছেলের তো নিজের বিয়ের ওপর হাত নেই! যাক্ গে সে কথা। আমার কথাটাই বলি। কিছু দিন আগে বাবা নিজেই আমাকে লিখেছিলেন বাসা করবার জন্যে। আমিই সাহস করি নি। আমি জানি, আমার স্ত্রী না থাকলে বাবার একটি দিনও চলবে না। কিন্তু তাও যদি বা চলে, ইদানি আমার মেয়েটিকে নিয়ে বাবা যে রকম মেতেছেন তাতে একজনকে আর একজনের কাছ ছাড়া করা অসম্ভব। মেয়েটা দুপুর রাত্রে কেঁদে ওঠে, দাদু যাব। তখনি তাকে বাবার বিছানায় দিয়ে আসতে হয়। এই তো অবস্থা! বাসা করি কি ক'রে বল ?

উমেশ রাগিয়া বলিল,—কাজ কি বাসা ক'রে? ওঠো হে, ওঠো। ওদিকে ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। এ তো আর ঘরের গিন্নী নয় যে, ভাত কোলে ক'রে বসে থাকবে?

উমেশ এবং সুনীল উঠিয়া পড়িল। বঙ্কু এবং বিলাসও উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু তপন তাহাদের টানিয়া বসাইল।

বলিল,—বোসো, বোসো।

বাসা করা সম্বন্ধে তপনের কি জানি কেন উৎসাহ দেখা গেল।

বলিল,—আচ্ছা বঙ্কুবাবু, আপনি যা বললেন, তাতে বোঝা গেল বাসা করা বোধ করি কখনই আপনার সম্ভব হবে না। আপনি যে সংসারের কথা বললেন, বাংলা দেশের শতকরা নিরেনব্বুইটি সংসার এমনিধারা। সর্ব্বত্রই একজনের সঙ্গে আর একজনকে স্নেহের বাধনে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু একটি কথা জানতে চাই,—আপনার স্ত্রীরও কি কখনও বাসা করার ইচ্ছে করে না?

বঙ্কু একটু ভাবিয়া বলিল,—ইচ্ছে কি আর করে না? কিন্তু করবে কি? স্নেহ আছে, দায়িত্ববোধ আছে, অন্তত চক্ষুলজ্জাও তো আছে? সকলকে ফেলে আসে কি ক'রে?

তপন আবার বলিল,—বুড়ো বাপ-মা আপনার, নাবালক ভাই-বোনও আপনার। স্নেহ হয় তো থাকতে পারে, কিন্তু আপনার বাপ-মা-ভাই-বোন সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্ববোধই বা কি, আর চক্ষু-লজ্জাই বা কোথায়?

এই সরল অথচ সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নে বঙ্কু একটু বিব্রত হইয়া উঠিল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—তোমার কথা ঠিক। কিছুই থাকার কথা নয়। কিন্তু কি জানো, গৃহস্থঘরের বৌ এ প্রশ্নটিকে অমন ভাবে কোনো দিন ভাবে নি। বাঙালীর মেয়ে পরের বাড়ীর বৌ হ'য়ে যেদিন থেকে আসে সেদিন থেকে সেই বাড়ীকেই সে আপনার বাড়ী ব'লে মেনে নেয়। প্রথম প্রথম সে চিন্তায় যদি বা কিছু ত্রুটি থাকে, দু-একটা ছেলেপুলে হ'লে তাও থাকে না। আমাদের সমাজের গঠনই এমনি।

তপন আপন মনে একবার বলিল,—সমাজের গঠন!

একটু পরে তপন বলিল,—আচ্ছা বঙ্কুবাবু, মনে করুন শহরের মেয়ে, পল্লীসমাজের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, পল্লীগ্রামে থাকতে যে অভ্যস্ত নয়,—তেমন কোনো মেয়ের সঙ্গে যদি পল্লীসমাজের কোনো ছেলের বিবাহ হয়, তা হ'লে ব্যাপার কি রকম দাঁড়াবে?

বিলাস হাসিয়া বলিল,—কি ব্যাপার বলুন তো তপনবাবু? তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না কি? আমরা কি আয়োজন করব?

তপনও হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—না, না। কোনো সম্ভাবনাই নেই। বঙ্কুবাবু সমাজের গঠনের কথা বললেন কি না। আমি জানতে চাচ্ছি সে গঠন কতখানি শক্ত,—কতটা আঘাত সইতে পারে।

বিলাস আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। বলিল,—দেখবেন মশাই, লুকোবেন না যেন।

কিন্তু বন্ধু এ সকল কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার নাড়ীতে টান বাজিয়াছে। এক দিকে স্নেহ-মায়া-মমতা, জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্ত্তব্যবোধ, বহুকালের সংস্কার,—অপর দিকে তাহার সমস্ত দেহ-মনের অনিবার্য্য বুভুক্ষা। তপনের প্রশ্নটা সে ভালো করিয়া ভাবিতেছিল। আশ্চর্য্য প্রশ্ন! বুদ্ধি দিয়া বিচার করিতে গেলে এক পথে যায়, মন দিয়া ভাবিতে গেলে যায় অন্য পথে। বন্ধু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কহিল,—

—দেখ, সমস্ত নির্ভর করে সেই পাড়াগাঁয়ের ছেলে আর শহরের মেয়েটির ওপর। তবে কি জান, বাপ-মাকে খেতে দেয় না বাঙালীর ঘরে এমন ছেলেও তো দুর্লভ নয়। তারা যদি সমাজের গঠন ভাঙ্‌তে না পেরে থাকে তাহ'লে এই শহরের মেয়েরাও পারবে না।

এ কথার উত্তরে তপনের অনেক কিছু বলিবার ছিল। সমাজের গঠন একদিনে একজন লোকের আঘাতে ভাঙে না। এমন অদৃশ্যভাবে ভাঙে যে কেহ টেরও পায় না কখন একটা বিশেষ প্রথার অবসান হইয়াছে। অহরহই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজদেহের এক দিক ভাঙিতেছে আর এক দিক গড়িতেছে। কিন্তু এত ধীরে ধীরে যে তাহা চোখেই পড়ে না।

তপন নীরবে সমস্যাটা ভাবিতে লাগিল।

১৩

এ যাত্রা মেস যে উঠিতে উঠিতেও টিকিয়া গেল সে শুধু মোহিতের কল্যাণে,—অথবা আরও শুদ্ধ করিয়া বলিতে গেলে তাহার অসুখের কল্যাণে। মোহিতের অসুখে মেসের লোকেরা কম সহ্য করে নাই, মোহিতও কম সহ্য করে নাই।

মেসের সকলেই পালা করিয়া রাত্রি জাগিয়াছে, রোগীর কাপড়-চোপড় বিছানার চাদর স্বহস্তে কাচিয়াছে, তাহার ঔষধ আনিয়াছে, রাত দুপুরে ডাক্তারের কাছে ছুটিয়াছে। এই কয় দিন তাহাদের আর বিশ্রাম ছিল না।

পক্ষান্তরে রোগীরও খোয়ার কম হয় নাই। ডাক্তার একগুণ বলিয়া গিয়াছেন তো মেসের লোকেরা দশগুণ করিয়াছে। রোগী একটু উঠিয়া বসিতে গিয়াছে কি দশজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অমন করিয়া বসিতে চেষ্টা করা নিষেধ। দশজনে মিলিয়া তাহার পিঠে মোটা করিয়া বালিশ দিয়া ধীরে ধীরে বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সেও কোনো রকমে মোহিত সহ্য করিয়াছিল। যখন শুনিল পায়খানায় সে যাইতে পারিবে না,—তাহার জন্য 'বেড্‌প্যান' কিনিয়া আনা হইয়াছে, তখন সে বেঁকিয়া বসিল। কিন্তু কে তাহার কথা শোনো!

এমনি করিয়া অবশেষে সে একদিন সারিয়া উঠিল। সেও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, মেসের লোকেরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এই কয় দিন ইহারা আর মেসের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই।

মোহিত সারিয়া উঠিলে কথাটা একবার উঠিল বটে, কিন্তু কাহারও মধ্যে সে ঝাঁঝ আর রহিল না। ব্যাপারটা জটিল আইনঘটিত। ইহার একটা মীমাংসা হওয়াও প্রয়োজন। সুতরাং মেসের সভা ডাকা হইল। তাহাতে কূটতর্ক কিছু যে উঠিল না তাহা নয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা মীমাংসাও হইয়া গেল।

মীমাংসা হইল এইরূপে :

মেসের ভালো সীট্‌টি সম্বন্ধে মুখুয্যে মহাশয় আর বেশী জেদ করিলেন না বটে, কিন্তু গ্লোলোককে সভার সমক্ষে মানিয়া লইতে হইল যে, আইনমতে ওই সীট্‌টি তাহার প্রাপ্য নয়, মুখুয্যে মহাশয়েরই। তিনি স্বেচ্ছায় ওখানির অধিকার ত্যাগ করিলেন। সভাস্থ সকলে আনন্দে করতালি দিল।

এ সমস্যা সহজেই মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যা লইয়া আইনের অনেক কচ্‌কচি উঠিল,—অবশ্য তেমন জোরে নয়।

হেমেন্দ্রবাবু প্রথমেই জোর গলায় বলিলেন, মেসের কাছ হইতে কোনোরূপ অনুগ্রহ লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। অনুগ্রহের কথাও নয়। ছোট ছেলেদের জন্য সর্ব্বত্রই অর্দ্ধেক চার্জ্জের ব্যবস্থা আছে। শুধু তাঁহার ছেলের জন্য নয়, যদি সভার অধিকাংশের মত হয় সে ব্যবস্থা সকলের জন্যই করিতে হইবে।

একজন প্রশ্ন করিল, ছোট ছেলে বলিতে কত বয়সের ছেলে বুঝিতে হইবে ?

—সে আপনারাই স্থির করুন।—বলিয়া হেমেন্দ্রবাবু বসিয়া পড়িলেন।

সভাপতির নির্দ্দেশে একজন উঠিয়া বলিল, কুড়ি বৎসর। আর একজন বলিল, আঠারো। তৃতীয় জন বলিল, ষোলো।

ভোট লইয়া ষোলো বৎসরই স্থিরীকৃত হইল।

সঙ্গেসঙ্গে আর একজন উঠিয়া প্রশ্ন করিল,—কিন্তু ছেলের বয়স যে ষোলো তার কি প্রমাণ নেওয়া হবে ?

সভাপতি নির্দ্দেশ দিলেন, সে সম্বন্ধে ছেলের অভিভাবকের মুখের কথাই যথেষ্ট। এবং অধিকাংশ বাবুই এই বাক্য সমর্থন করিল।

তার পরে উঠিল খালি সীটের ব্যবস্থার কথা।

প্রস্তাব উঠিল,—কোনো সীট খালি পড়িলে তাহার ভাড়া অতিরিক্ত মেম্বারদের মধ্যে অংশানুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

—'অংশানুপাতে' মানে কি ?

—মানে পূর্ণবয়স্কের পুরা ও ছোট ছেলের অর্দ্ধেক।

—যদি তিনটি সীট্ খালি পড়ে আর মাত্র দু'জন থাকে অতিরিক্ত মেম্বার ?

—তাহ'লে দুজন দুটো সীটের ভাড়া দেবে আর একটা সীটের ভাড়া 'এষ্টাব্লিশমেণ্টের' মধ্যে পড়বে।

—তুজনের একজন যদি ছোট ছেলে হয় ?

—তাহলে ছোট ছেলেটি দেবে অর্দ্ধেক সীটের ভাড়া, পূর্ণবয়স্ক একটি সীটের ভাড়া আর বাকীটা যাবে 'এষ্টাব্লিশমেণ্টে'।

অনেক তর্ক উঠিল,—বহু প্রকারের নূতন প্রস্তাব এবং বহুতর প্রকারের সংশোধনী। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উল্লিখিত প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

তার পরে উঠিল থালা-বাসনের কথা। এ সমস্যাটি এ দিনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। তথাপি উঠিল।

মেসের সকলে থালা-বাসন দেয় নাই। সে জন্য অনেক লোক এক সঙ্গে খাইতে বসিলে থালার অকুলান পড়ে। প্রতিদিন সকালে আফিস যাওয়ার সময় এবং রবিবারে এ সম্বন্ধে কথা অনেক ওঠে, কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় না। যাহারা থালা দিয়াছে তাহারা এই সভাতেই এ সম্বন্ধে একটা আইন করিবার জন্য জেদ ধরিল।

যাহারা থালা দেয় নাই তাহারা প্রথমে বলিল, কাঁসার থালা-বাসনের বদলে মেস হইতে এনামেলের থালা-বাসন কেনা হউক।

থালাওয়ালার দল আপত্তি তুলিল, এনামেলের থালা-বাসনে ভদ্রলোক খাইতে পারে না।

প্রতিপক্ষদল সগর্ব্বে বলিল,—আমরা পারি। যাঁদের অসুবিধা হবে তাঁরা নিজের নিজের কাঁসার বাসনে খেতে পারেন। কিন্তু এটা তো শ্বশুরবাড়ী নয়, আমাদের এনামেল হ'লেই চলবে। আজকে আমরা তাই কিনে এনে মেসে জমা দোব।

থালাওয়ালারা ইহাতেও আপত্তি করিল। কারণ তাহারা জানে, মেসের ব্যাপার। আজ তাহারা এনামেলের বাসন কিনিয়া আনিবে বটে, কিন্তু আসল সময়ে যে যাহার থালা পাইবে বসিয়া যাইবে। কে তাহার হিসাব রাখিবে? লোকে তো আর থালার হিসাব রাখিবার জন্য আফিস কামাই করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না!

অপর পক্ষ জবাব দিল, কাঁসার থালাওয়ালারা নিজের নিজের থালা নিজের নিজের কাছে রাখিতে পারে। খাওয়ার সময় থালা হাতে করিয়া লইয়া যাইবে, খাওয়া শেষ হইলেই চাকরে ধুইয়া মাজিয়া ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়া যাইবে।

থালাওয়ালার দল এ উত্তরে চটিয়া গেল। তাহারা সমস্বরে বলিল,—কাঁসার থালা দিতেই বা তোমাদের অত আপত্তি কিসের?

—আপত্তি আছে। ক'দিনের জন্যে থাকা, তার আবার কাঁসার থালা। এ কি ঘর-বাড়ী?

অবিনাশ মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন,—ওহে এইটেই আমাদের আসল ঘর, আসল বাড়ী। বাড়ীটাই বাসা,—রাত্রির অন্ধকারে যাই, রাত্রির অন্ধকারে চলে আসি। বুঝলে? এই বাড়ী।

অবিনাশ শেষের কথাটার উপর জোর দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রতিপক্ষ দল কিন্তু মিষ্ট হাস্যে ভুলিবার পাত্র নয়। তাহারা বলিল,—তা হোক। আমাদের এনামেলেই চলবে। সুখের তো আর অন্ত নেই! ওটুকু অসুবিধাও সইবে।

এবারে অবিনাশবাবুও চটিয়া গেলেন। বলিলেন,—তাহ'লে ভোট নেওয়া হোক।

ভোটে থালাওয়ালারাই জিতিয়া গেল। কিন্তু আবার একটা নূতন ফ্যাঁকড়া উঠিল। হিসাবে দেখা গেল, দশ জন বাবু একটি করিয়া থালা গ্লাস বাটি জমা দিয়াছে। তাহার মধ্যে আছে মাত্র সাতখানি থালা (তাহারও একখানি ভাঙা), গোটা আষ্টেক গ্লাস এবং ছয়টি বাটি। বাকী ?

ম্যানেজার অম্লান বদনে বলিলেন, কিছু ভাঙিয়া গিয়াছে, কিছু হারাইয়াছে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, মেসের কয়েকজন বাবু যাওয়ার সময় নিজের থালা-বাসন না পাইয়া অপরের জিনিস লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ম্যানেজার সে সময় উপস্থিত ছিলেন না।

বিরুদ্ধ পক্ষ সুযোগ পাইয়া জোর গলায় বলিল,—তবে ?

থালা অপহৃত হওয়ার সংবাদ পাইয়া সকলেই ছুটিতে ছুটিতে নীচে গেল। কিছুক্ষণের জন্য সভা স্থগিত রহিল। মিনিট পনেরো পরে তাহারা চীৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। যাহাদের চুরি যায় নাই তাহাদের বেশ উৎফুল্ল মনে হইল। যাহাদের হারাইয়াছে তাহারা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—তাহ'লে আমাদের কি হবে ?

সুযোগ পাইয়া প্রতিপক্ষ দল অম্লান বদনে বলিল,—নতুন কাঁসার থালা কিনে দিতে হবে।

থালাহারার দল গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

—কিনে দিতে হবে ? কথ্‌খনো না।

দুই পক্ষে কিছুক্ষণ তুমুল-কলহ চলিল। অবশেষে অবিনাশবাবু মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—যাদের থালা হারিয়েছে মেস থেকে তাদের থালা কিনে দিতে হবে।

প্রতিপক্ষ দল বেঁকিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—কিছুতে না।

অবিনাশ বাবু মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন,—কতই বা পড়বে? জন পিছু পাঁচ আনার বেশী নয়।

প্রতিপক্ষ দল জেদ ধরিয়া বসিল,—পাঁচ পয়সা হ'লেও দোব না। কেন দোব? বরং চাকরের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হ'ক।

কিন্তু কোথায় সে চাকর! কিছু দিন হইল সে চলিয়া গিয়াছে, আবার নূতন চাকর আসিয়াছে।

প্রতিপক্ষ দল সে কথায়ও কর্ণপাত করিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল,—তা আমরা কি জানি! ম্যানেজার কেটে নেন নি কেন?

অগত্যা ভোট!

অতি সামান্য সংখ্যক ভোটের জোরে ঠিক হইয়া গেল, যাহাদের থালা-বাসন হারাইয়াছে মেস হইতে তাহাদের থালা বাসন কিনিয়া দেওয়া হইবে। তবে ভবিষ্যতে থালা-বাসন হারাইলে চাকরের মাহিনা হইতে দাম কাটিয়া লওয়া হইবে। ম্যানেজার অবিলম্বে যেন চাকরকে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন।

আবার আপত্তি উঠিল, এই থালা-বাসন কাহার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে? যাহার হারাইয়াছে তাহার, না মেসের?

থালাহারার দল বলিল, যাহার হারাইয়াছে তাহার।

অপর একদল বলিল, মেসের। অর্থাৎ যদি এই সকল লোক মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়, থালা-বাসন তাহারা লইয়া যাইতে পারিবে না।

থালাহারার দল বলিল,—তা কেমন করিয়া হইবে? মেসে যে নূতন আসিবে তাহাকেই থালা-বাসন জমা দিতে হইবে। তাহা হইলে তো এই কয়টা জিনিস উদ্‌বৃত্ত থাকিবে।

অপর পক্ষ বলিল,—তা থাকুক।

—কিন্তু আমাদের জিনিস যে হারাল, তার কি?

—হারিয়ে গেছে, গেছে। তার আবার কি হবে?

অবার একটা তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বাধিল। এক পক্ষ এই কয়টা জিনিসের জন্য প্রাণ দিতে পারে; অপর পক্ষের তুচ্ছ কয়টা অপহৃত জিনিসের জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা আছে বলিয়া মনে হইল না।

অবশেষে ভোট।

থালাহারার দল বহু ভোটে হারিয়া গেল। মেসের সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রায় সকলেই তাহাদের বিরুদ্ধে ভোট দিল। হইলই বা দু'দিনের পান্থনিবাস! কিন্তু এ তো তাহাদেরই। পেন্‌শন না লওয়া পর্য্যন্ত এই মেস নামক অদৃশ্য পদার্থটিকেই তো এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী এবং এক পাড়ায় লইয়া বেড়াইতে হইবে। মেসেরও সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে।

১৪

সেদিন বিকালে তপন গিয়া দেখিল, শ্যামলী বই খাতাপত্র এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে। একটু পূর্ব্বেই বোধ হয় ভায়ের সঙ্গে খুনসুড়ী হইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া পল্টু তাড়াতাড়ি নিজের সোফায় শান্তভাবে গিয়া বসিয়াছে, কিন্তু তখনও হাঁফাইতেছে।

তপন শ্যামলীকে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, —কি রকম? পড়াশুনো সব শেষ হ'য়ে গেছে না কি?

দিন দিন শ্যামলীর সাহস বাড়িতেছিল। সে মুখ নামাইয়া হাসি ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

তপন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বাঁচা গেল! এইবার আমার মাইনেটা চুকিয়ে দিলেই আসতে পারি।

তেমনিভাবে থাকিয়াই শ্যামলী বলিল,—বেশ তো।

তপন তাহার চোখে চোখ ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। শ্যামলী একবার মুখ তুলিতেই হাসিয়া বলিল,—সেটা দেবেন কে? তোমার বাবা, না তুমি?

—কার কাছে চান?

—বলছি। পল্টু, এক গ্লাস জল নিয়ে এস তো ভাই।

পল্টু উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু শ্যামলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—তুই পারবি না, আমি আনছি।

শ্যামলী কোনো দিকে না চাহিয়া জল আনিতে গেল। তপন তাঁহার দিকে চাহিয়া আর একবার উপলব্ধি করিল, শ্যামলীকে যত ছোট সে মনে করিত, তত ছোট নয়। কি যেন একটা আশঙ্কায় মেয়েটির মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে।

এক মিনিটের মধ্যে শ্যামলী জল লইয়া আসিল, শুধু এক গ্লাস জল। সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া সে আবার নিজের আসনে গিয়া বসিল। তপনের জলের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তবু উপায় নাই। দুরন্ত শীতেও জোর করিয়া আধ গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল শ্যামলী হাসি ঢাকিবার জন্য শাড়ীর প্রান্তটা বার বার মুখে ঘসিতেছে।

নিজের স্বেচ্ছাকৃত দুর্গতিতে তপনও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, —পড়াশুনো তো শেষ হ'য়ে গেছে। তাহ'লে ?

—গল্প বলুন।

—রোজ রোজই গল্প ?

শ্যামলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

পল্টু তাহার একমাত্র ছবির বইখানা হাতে লইয়া টেবিলের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—একটা বাইসনের গল্প বলুন।

তপন তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল,—বাইসন দেখেছ ?

পল্টু ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, দেখিয়াছে। বলিয়া আঙ্গুল দিয়া বইএর খোলা পাতার একটা ছবি দেখাইয়া দিল।

তপন শ্যামলীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—না, বাইসনের

না। একটা রাজকন্যার গল্প বলি শোনো। এক ছিল রাজা। রাজার একটি পরীর মতো ফুটফুটে মেয়ে ছিল।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল,—না, ওটা না।

এই গল্পটি আরও একদিন তপন বলিয়াছে। রাজকন্যা উপলক্ষ মাত্র, গল্পটি আসলে শ্যামলীর। একটি বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে গরীবের ছেলের বিবাহ হইল এই গল্প। তপন দেখিয়া আনন্দিত হইল, সে কাহিনীর গূঢ়ার্থ বুঝিতে শ্যামলীর বিলম্ব হয় নাই।

বলিল,—তবে কি গল্প বল্‌ব ?

শ্যামলী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—যা খুশী।

তপন হাসিয়া বলিল,—আমি ওই একটা গল্পই জানি, রাজকন্যার সঙ্গে গরীবের ছেলের বিয়ে।

পল্‌টু এতক্ষণ পর্য্যন্ত সকৌতুকে উভয়ের কলহ শুনিতে ছিল। রাজকন্যার বিবাহের কথায় তাহার কি মনে হইল সেই জানে, সে অকস্মাৎ করতালি দিয়া বলিল,—ও হো, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে কিনা, তাই খালি বিয়ের গল্প। আর আমি বললাম বাইসনের গল্প তা শোনা হ'ল না। দাঁড়াও না, বাবা আসুন। তার পর দেখাচ্ছি।

লজ্জায় শ্যামলীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিল,—এই পল্‌টু !

পল্টু দমিবার ছেলে নয়। বলিল,—বলব না ? হবে তো বিয়ে !

শ্যামলী তপনের দিকে চাহিয়াই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই ছুটিয়া গিয়া পল্টুর গালে দুই চড় কসিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেল। এ চড় যে আদরের তাহা বুঝিয়া পল্টু আরও জোরে হাসিয়া উঠিল।

তপনেরও কৌতুক বোধ হইতেছিল। শ্যামলীকে ডাক দিয়া বলিল,—যাচ্ছ কোথায়? পড়তে হবে না?

শ্যামলী পিছন ফিরিয়া একবার সহাস্যে চাহিয়াই চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,—কালকে।

এই বিবাহে যে সুরেন্দ্রবাবুর শুধু সম্মতি নয়, সম্পূর্ণ আগ্রহ আছে তাহা তো বোঝাই যায়। তপনের চাকুরীটি খুব সম্ভবতঃ হইয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রবাবু কাহারও চাকুরীর জন্য কোনো দিন সাহেবকে অনুরোধ জানান নাই। তাঁহার প্রথম এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কথনই সাহেব ঠেলিতে পারিবেন না। মুখেও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন বলিয়াই আশ্বাস দিয়াছেন। এ চাকুরী হইয়া গেলে তপনের মতো ছেলেকে জামাই করিবার কোনো আপত্তিই উঠিতে পারে না।

তপনের ছোটদাদার সঙ্গেও তিনি প্রত্যহই মহোৎসাহে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন,—কিন্তু গোপনে, অর্থাৎ তপন যেন এখন জানিতে না পারে। কিন্তু তপনের কিছুদিন হইতে বৌদিদির প্রতি

শ্রদ্ধা আশ্চর্য্য রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। সপ্তাহে অন্তত দুইটা দিন শ্যামবাজার পাড়ি দিতেছে। মুখে সে বলে বটে যে, চাকুরীর কি কতদূর হইল ছোটদাদার কাছ হইতে তাহারই সন্ধান লইবার জন্য এতদূর আসা, কিন্তু বৌদিদি সে সব ছাড়িয়া শুধু বিবাহের কথাই আলোচনা করে।

তপন ক্লান্তভাবে বলে,—ওসব কথা থাক বৌদি, চাকরী সম্বন্ধে ছোড়দা কি বলেছে বলুন।

বৌদিদি বিস্মিত ভাবে বলে,—তুমি কি চাকরীর খবর জানবার জন্যে এতদূর হেঁটে এলে?

তপন হাসিয়া বলে,—না তো কি বিয়ের খবর শোনবার জন্যে?

—আমি তো তাই ভেবেছিলাম!

—ভুল ভেবেছিলেন। এখন বলুন, চাকরীর কি হ'ল?

বৌদিদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলে,—এত ন্যাকামিও জানো ঠাকুরপো! চাকরী কি আমার হাতে? যাঁদের বাড়ী রোজ পড়াতে যাও চাকরীর খবর রাখেন তাঁরাই। আমি কি জানব?

তপন বলে,—আচ্ছা বেশ। আর ঝগড়ায় কাজ নেই। আপনি যা জানেন তাই বলুন, আমি অবহিত হ'য়ে শুনি।

—সেই ভালো।

এমনি ভাবে বৌদিদির মারফৎ বিবাহ সম্বন্ধে সকল খবর তপনের কানে যথাসময়ে পৌছে। কেবল একটি কথা নয়। সেই কথাটি সুরেন্দ্রবাবু তপনের ছোট দাদাকে বলেন না। বলেন না

এই জন্য যে, এখন তাঁহার স্ত্রীর আপত্তি করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তপনের একটা চাকরী হইয়া গেলে আর করিবেন না। মেয়ের বিয়ে বড় ঘরে দেওয়ার ইচ্ছা মায়েদের একটা রোগ। ওটা পরে সারিয়া যায়।

মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রীর সঙ্গে যে সকল আলোচনা তিনি করিতেন তাহা পারৎপক্ষে ছেলেমেয়েদের অসাক্ষাতে করিতেই চেষ্টা করিতেন। শ্যামলী তপনের কাছে পড়িতেছে। এ সময় ইহাদের উভয়ের পক্ষেই কথাটা না জানিলেই পড়ার এবং পড়ানোর সুবিধা হয়। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে বয়স্কা মেয়ের কানকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। পিতামাতার সকল আলোচনাই শ্যামলীর কানে পৌঁছে। দেখিতে দেখিতে শুধু শ্যামলী নয় বাচ্চা পল্টুর পর্য্যন্ত এ কথা অজানা রহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু প্রথম যখন গৃহিণীর কাছে এ কথা পাড়িয়াছিলেন, তিনি তাহাতে বিশেষ কান দেন নাই,—নিঃশব্দে হাসিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন যে, এ প্রস্তাব সুরেন্দ্রবাবু পরিহাস করিয়া করেন নাই, সত্যই তাঁহার মনের ইচ্ছাও সেইরূপ, ততই তাঁহার আপত্তি প্রবলতর হইতে লাগিল।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তপনের সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হবে?

—কেন? ক্ষতি কি? তপন বি-এ পাশ ক'রেছে বেশ ভালো ক'রেই। যেমনি দেখতে সুন্দর, তেমনি স্বভাব-চরিত্র। ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে তো ভাগ্যের কথা।

—অমন ভাগ্যের মুখে আগুন! শুধু রূপ-গুণ থাকলেই হ'ল? ঘরে কি আছে না আছে খবর নিয়েছ?

—নিয়েছি। বিশেষ কিছু নেই।

—তবে?

—তবে কি? যে চাকরীর জন্যে চেষ্টা করছি সেটা যদি ভগবানের ইচ্ছায় হয় তাহ'লে বাড়ীর অবস্থায় কি যায় আসে? ওর নিজের ভাগ্য ও নিজেই তৈরী ক'রে নেবে।

—হুঁ। তাই'লে আর ভাবনা ছিল কি?

—তার মানে? তোমার বাবা যেদিন তোমাকে আমার হাতে দেন সেদিন আমার কি ছিল? আজকে সবই তো হ'য়েছে,—বাড়ী, গাড়ী, সব। কপালে থাকলে এমনি ক'রেই হয়।

গৃহিণী এবারে অসহিষ্ণুভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—তাই ব'লে প্রাইভেট মাষ্টারের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে?

—কেন, প্রাইভেট মাষ্টার কি মানুষ নয়, না ভদ্রলোক নয়? তা ছাড়া চাকরীটা হ'লে ও কি আর মাষ্টারী করবে? সেই জন্যেই তো দেরী করছি।

—কিন্তু লোকে তো বলবে, কুড়ি টাকার প্রাইভেট মাষ্টারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে শুধু টাকা বাঁচাবার জন্যে।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—না তা বলবে না। লোককে বোলো আমি বাড়ী বন্ধক দিয়ে মেয়ের বিয়ে বাবুগঞ্জের মুখুয্যে বাড়ীতে দিয়েছি, তাদের সেই গণ্ডমূর্খ মাতাল ছেলেটার সঙ্গে।

মায়ের আপত্তির কথা শ্যামলী ভালো করিয়াই জানে। তাই তপনের ব্যাপারে সে সর্ব্বপ্রকারে মাকে এড়াইয়া চলে। বায়োস্কোপ দেখিয়া ফিরিবার দিন পল্টুকে বহু প্রলোভন দেখাইয়া বারবার করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, তপন যে তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল এ কথা মাকে যেন না জানায়। এ সকল কথা পল্টুকে জানাইতেও তাহার লজ্জা করে। কিন্তু মায়ের তিরস্কার হইতে আত্মরক্ষা করিতে গেলে উপায়ান্তরই বা কি ?

তপন তাহাকে যত ছোট ভাবিয়াছিল তত'ছোট সত্যই সে নয়। তাই বলিয়া যে বয়সে মেয়েদের মনে ভালোবাসা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় সে বয়সও তাহার নয়। ওই কখনও চকিত-চঞ্চল কখনও ঘনপল্লবভারাতুর নয়ন দুটি দেখিয়া যাহাই কেন মনে হউক না আজও সে মুদিত কমল-কলিকা মাত্র। আলোর স্পর্শ সবে চোখে লাগিয়াছে। সে স্পর্শ মনে আনে শিহরণ, দু'চোখে বহিয়া আনে অফুরন্ত স্বপ্ন। সে-আনন্দ সে শুধু মনে-মনে অনুভব করে, স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না।

তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, তপনকে তাহার কেমন লাগে। লজ্জায় সে তাহার উত্তর দিতে পারিবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি উত্তর দেয়, এক মিনিট না ভাবিয়া বলিবে,—ভালো লাগে, বেশ লাগে, চমৎকার লাগে। তপনের সঙ্গে বিবাহ হইলে সে আনন্দিত হইবে। একান্ত নিভৃতে কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তপনের কাছে আত্মদান করাও হয় তো তাহার পক্ষে অসম্ভব নয় !

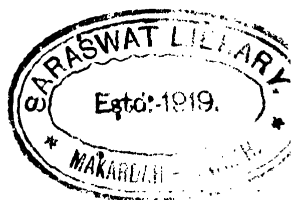
কিন্তু ভালোবাসা ?

পান্থনিবাস

প্রথম যৌবনের প্রথম পুরুষ আসে একান্ত লঘু চরণপাতে, অলক্ষিতে, প্রিয়তমার চোখে স্বপ্নের অঞ্জন বুলাইয়া দিয়া কখন যে তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া যায়, বোঝাই যায় না। কখন যায়, কোনো চিহ্নই রাখিয়া যায় না। ভাবী জীবনের বিরল অবসরে সান্ধ্য মেঘের বর্ণসুষমা মনকে অকারণেই হয় তো একটু বিষণ্ণ করে, হয় তো করে না। সে কিছুই নয়। প্রথম যৌবনের প্রথম পুরুষকে ভালোবাসিয়াছে কি না কোন মেয়ে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

তবে হ্যাঁ, তপনের সান্নিধ্য, তাহার সুতীক্ষ্ণ পরিহাস, নিঃশব্দ মৃদু হাস্য শ্যামলীকে আনন্দিত করে। মধ্যাহ্ন গড়াইয়া গেলেই তপন কখন আসিবে বলিয়া শ্যামলী প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত দুঃসহ ব্যাকুলতায় গণনা করে। চলিয়া গেলেই শ্যামলীর চিত্ত বিষণ্ণ হইয়া ওঠে, মনে হয় সেদিন আর তাহার কোনো কাজ নাই, —সেদিনের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, আবার পরের দিন। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বান্ধবীর সম্মুখে আপনার সমস্ত অন্তর উদ্‌ঘাটিত করিয়া শ্যামলী ইহাও বলিয়া ফেলিতে পারে, তপনকে সে চায়, তপনকে নহিলে সে বাঁচিবে না।

পনেরো-ষোলো বৎসরের মেয়ের মুখে এ কথা শুনিয়া যদি বলিতে চাও ইহাই ভালোবাসা তো তাই, না বলিতে চাও তো নয়।



১৫

বাইশে ডিসেম্বর তপনের কাছে চিরস্মরণীয় দিন। সেদিন সে নিয়োগপত্র পায়। সুরেন্দ্রবাবুর সাহেব তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভাঙেন নাই। দিন কয়েক আগে তিনি তপনকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তপন তাঁহার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট দিনে সাক্ষাৎ করে। সাহেবের হাসি দেখিয়া সেদিনই তাহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, চাকুরীটি বোধ হয় হইয়া যাইবে। ভাবিয়াছিল, বড়দিনের আগে আর কিছু হইবে না,—ছুটির পর ফলাফল জানা যাইবে।

কিন্তু বড়দিনের ছুটির ঠিক আগের দিনই অপ্রত্যাশিত ভাবে পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল,—ফলাফল নয়, একেবারে নিয়োগপত্র।

সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। মেসে একটা লোক নাই যাহার কাছে এই সুসংবাদটা চীৎকার করিয়া জানাইতে পারে। সকলেই আফিস গিয়াছে। আছে মাত্র ঠাকুর আর চাকর। আনন্দের আবেগে তাহাদের কাছেই কথাটা প্রথম প্রকাশ করিল। এমন কি, প্রথম মাসের মাহিনা পাইলে তাহাদের দুইজনকে দু'খানা কাপড় বকশিস দিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়া ফেলিল।

দুপুরে সে কোনো দিন আফিস-অঞ্চলে বাহির হয়, কোনো দিন হয় না। আসলে সে কুড়ে মানুষ; অকারণ ঘুরিতে

ভালোবাসে না। অকারণ ঘুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে নিদ্রাই তাহার প্রিয়। তবু যে বাহির হয়, সে নিতান্তই পেটের দায়ে,—যদি কোথাও লাগিয়া যায় এই ভরসায়। নিরাশ হইয়া যখন ফিরিয়া আসে তখন আর তাহার বিরক্তির সীমা থাকে না। সে বিরক্তি যতটা চাকুরী না হওয়ার জন্য, তাহার চেয়ে বেশী অনর্থক শরীরকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য।

আজ সে পূর্ব্বেই আফিস-অঞ্চলে বাহির হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন নিয়োগপত্র পাওয়ার পরে তো আর তার কোনো প্রয়োজনই রহিল না। তপন শীতের দ্বিপ্রহরে লেপ গায়ে দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওয়ার আয়োজন করিল।

কিন্তু এত দিনের সাধা নিদ্রা আজ প্রথম তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। চোখ বন্ধ করিলেও যে নিদ্রা আসে না এমন কখনও হয় নাই। কিন্তু আজ যতবার চোখ বন্ধ করিল, ততবারই মন তাহার কল্পনার পর কল্পনায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একশো পঁচিশ টাকা মাহিনা। দুই বৎসর শিক্ষানবিশ থাকিতে হইবে, তার পরে দেড়শোতে চাকুরী আরম্ভ হইবে। এই নিকৃষ্ট মেসটায় থাকিতে তাহার ইচ্ছা নাই। কিন্তু এখানে খরচ অত্যন্ত কম হয়। পঁচিশ টাকায় চমৎকার চলিয়া যাইবে,—বড় জোর ত্রিশ। তবে এখন কিছু দিন টানাটানি করিয়া পঁচিশের উপর ওঠা হইবে না। দেশে তাহার পিতার কিছু টাকা দেনা আছে। পুরা এক শত টাকা করিয়া পাঠাইতে পারিলে সে টাকা এক বৎসরের মধ্যেই শোধ হইয়া যাইবে। আসলে একশো পঁচিশে

তাহার হয় না। আরও একটা বৎসর অন্তত অপোগণ্ড ছাত্র দুইটিকে পড়ানো ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। সেই টাকাটায় দেশের সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ওই এক শত টাকার সমস্তটাই দেনা শোধে দিতে হইবে।

একটা বৎসর,—মাত্র একটা বৎসরই তাহার সময়। তার পরে বাসা করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। সুরেন্দ্রবাবু সম্ভবত ফাল্গুনেই বিবাহটা শেষ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন। বড় জোর আষাঢ় মাসটা পর্য্যন্ত সময় লওয়া চলিবে। তার বেশী সময় লওয়া ঠিকও হইবে না। ভদ্রলোক সন্দেহ করিতে পারেন, ছেলেটি চাকুরী বাগাইয়া লইয়া এখন দিন পিছাইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য সন্দেহ করিবার মতো লোক তিনি নন। কিন্তু যাহাতে মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে অনর্থক তেমন কাজ করারই বা প্রয়োজন কি? তবে হ্যাঁ, ফাল্গুনে সত্যই বড় তাড়াতাড়ি হয়। সে কথা বুঝাইয়া বলিলে সুরেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই বুঝিবেন। মেয়েও তাঁহার কিছু অরক্ষণীয়া নয়। আষাঢ়ে বিবাহ হইলে কিছুই ক্ষতি হইবে না।

—আষাঢ়ে যদি বিবাহ হয়,—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিনে শ্যামলী ঘর-বসতে তাহাদের দেশে যাইবে। অলক্ষিতে তাহার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পল্লীগৃহে শ্যামলী একগলা ঘোমটা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শনিবার রাত্রে তাহার প্রতীক্ষায় মেঝেয় বড় করিয়া বিছানা পাতিতে বসিয়া অকস্মাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দেবতাকে

প্রণাম করিতেছে,—আর কেহ নয় শ্যামলী, যে জুতা পায়ে দিয়া অনবগুণ্ঠনে কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় অবলীলাক্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে নিজের গৃহে এক পাও জুতা ছাড়া চলে না, চেয়ারে বসিয়া ইংরাজি পড়ে,—সেই শ্যামলী তাহার দরিদ্র কুটীরে মেটে আঙ্গিনায় নগ্ন পদে ঘুরিতেছে, এ কথা মনে করিতেও তাহার কৌতুক বোধ হইতেছিল।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ে শ্যামলীর কষ্ট হইবে নিশ্চয়ই। অভ্যাস তো নাই। তাহার উপর ম্যালেরিয়া। সুরেন্দ্রবাবু তাহার সঙ্গে যে শ্যামলীর বিবাহ দিতেছেন সে শুধু এই ভরসায় যে ভালো চাকুরী হইলে সে কখনই শ্যামলীকে পাড়াগাঁয়ে ফেলিয়া রাখিবে না। মুখে বলেন নাই বটে, কিন্তু তাহার মতো দরিদ্রকে জামাতা করিবার আর কি হেতু থাকিতে পারে? সুরেন্দ্রবাবুর মেয়েকে ঘরে আনিবার আর কোনো যোগ্যতাই তো তাহার নাই। এবং শ্যামলী যে পাড়াগাঁয়ে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না এও তো মিথ্যা নয়।

না, বেশী দিন শ্যামলীকে দেশে ফেলিয়া রাখিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ,—অগ্রহায়ণেই তাহার বাসা করা উচিত। কিম্বা বড় জোর মাঘ। মাঘে বাসা করিতেই হইবে।

তপন হিসাব করিয়া দেখিল, এই একটা বৎসরই তাহার দেনা শোধ করিবার সময়। ইহার মধ্যে শোধ করিয়া ফেলিতে না পারিলে আর জীবনে শোধ করিবার সুযোগ হইবে কি না সন্দেহ।

কিন্তু থাক সে সব কথা। এখন নিদ্রা দেওয়াই ভালো।

বিকালের দিকে ঘুম হইতে উঠিয়া একবার সুরেন্দ্র বাবুদের ওখানে যাইতে হইবে। তপন লেপটা ভালো করিয়া জড়াইয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। কিন্তু ঘুম আর কিছুতে আসে না। ভাবিবার বিষয় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

একটা কথা বিবেচনা করিবার আছে, ইহার পরে শ্যামলীকে পড়ানো ঠিক হইবে কি না। অপর দুইটি ট্যুইশান এখনও এক বৎসর অন্ততঃ রাখিতে হইবে। কিন্তু শ্যামলীকে পড়ানো আর সঙ্গতও হইবে না, শোভনও হইবে না। দেখিতেও বিশ্রী লাগে। এতদিন পড়াইয়াছে, পড়াইয়াছে। সে অন্য কথা। ভিতরে ভিতরে যাহাই হউক, প্রকাশ্যে তো আর বিবাহের আলোচনা হয় নাই। অতঃপর প্রকাশ্যেই আলোচনা চলিবে। এখন আর পড়ানো চলে না। তপন ভাবিয়া দেখিল, ওই কুড়িটা টাকার প্রলোভন ছাড়িতেই হইবে।

নাঃ! ঘুম আর কিছুতেই আসে না। তপনের মনে হইল, সুমুখের জানালা দিয়া চোখে আলো লাগিতেছে বলিয়াই বোধ হয় ঘুম আসিতেছে না। সে জানালাটা বন্ধ করিয়া আবার একবার নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টা করিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ঘুম আর কিছুতে আসে না। নানা চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, মনের মধ্যে আসিয়াছে অস্থিরতা। যতবারই চোখ বন্ধ করে ততবারই নানা চিন্তা মস্তিষ্কের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে,—নিদ্রা কোথায় উড়িয়া যায়।

অবশেষে তপনকে উঠিতে হইল। জামাটা গায়ে চড়াইয়া,

একটা আলোয়ান কাঁধে ফেলিয়া তপন বাহির হইয়া গেল। কোথায় যে যাইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাহা কোনো দিন করে নাই তাহাই করিয়া ফেলিল, সুমুখেই একটা ট্রাম দেখিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল। চাকুরী যদিচ এখনও হয় নাই, তবু এই কয়টা পয়সা অপব্যয় করা এখন আর অশোভন নয়।

অনেক ঘুরিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই তপন শ্যামলীদের বাড়ী পৌঁছিল। নীচে পল্টু একটা কলের ইঞ্জিন লইয়া খেলা করিতেছিল।

পল্টু উঠিল না। সেইখানে বসিয়া ইঞ্জিনে দম দিতে দিতে ডাক দিল,—দিদি, শীগ্‌গির, মাষ্টার এসেছেন।

শ্যামলী বোধ হয় নীচে নামিয়াই আসিতেছিল। পল্টুর চুল ধরিয়া টান দিয়া ভেঙাইয়া বলিল,—মাষ্টার এসেছেন! মাষ্টার মশাই বলতে পারো না?

দিদির তিরস্কার পল্টু কোনো দিনই গায়ে মাখে না। অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাত দিয়া মাথায় একবার হাত-বুলাইয়া বলিল, ইঞ্জিনটা কেমন ছুটছে দেখছ?

—দেখছি।

বলিয়া শ্যামলী হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। আজ তাহার সাজ সজ্জায় একটু পারিপাট্য ছিল।

সেদিকে চাহিয়া তপন বলিল,—কোথাও বের হচ্ছ না কি ?

শ্যামলী লজ্জিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া নিজের জায়গায় বসিল।

—তাই হোক। আমি ভাবলাম···যে রকম সাজ-পোষাক করেছ···

শ্যামলী আর লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

তপন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—একটা সুসংবাদ আছে।

শ্যামলী এবার মুখ তুলিয়া চাহিল। হাসিয়া বলিল,—জানি। কবে খাওয়াচ্ছেন, বলুন ?

তপন হাসিয়া বলিল,—সে হবে একদিন। কিন্তু তাতে তোমার কি শ্যামলী, তোমাকে খাওয়াতে তো পারব না।

শ্যামলী কথাটা ঠিক বুঝিল না। কহিল,—আমার অপরাধ ?

দেখিতে দেখিতে তপনের মুখ আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। চটুল চোখে জাগিল স্নিগ্ধতা, পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বরে আসিল গাম্ভীর্য্য। গাঢ় কণ্ঠে তপন কহিল,—না তোমাকে নয়, আর আমার নিজেকে নয়।

তপনকে এমন বিচলিত হইতে শ্যামলী আর কখনও দেখে নাই। সে সবিস্ময়ে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

তপন বলিতে লাগিল,—আজ সকাল পর্য্যন্তও অনেক আশঙ্কাই মনে মনে ছিল। এখন মন আমার পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, সাহসও বেড়েছে,—তোমাকে আর কিছুতে ভিন্ন ভাবতে পারি না। কিন্তু তার আগে একটা কথা জানতে চাই, বলবে ?

আশঙ্কায় শ্যামলীর মুখ পাংশু হইয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর

না দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। তপন ঘুরিয়া ওদিকে গিয়া টেবিলে ঠেস দিয়া একেবারে শ্যামলীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

কহিল,—জানতে চাই, তোমরা আমার বাড়ীর অবস্থার কথা জানো কি না। আমরা খুবই দরিদ্র। জানো সে কথা?

সুগভীর লজ্জায় এবং অজানিত আশঙ্কায় শ্যামলীর মাথা প্রায় টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তপনের দ্বিতীয় প্রশ্নে সে কোনো রকমে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, জানে।

তপনের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সুগভীর স্বস্তির একটা নিশ্বাস পড়িল। যাক্, বাচা গেল। একটা দুশ্চিন্তার শেষ হইল। এর পরে আর কেহ বলিতে পারিবে না যে, সে ফাঁকি দিয়া আপনার অবস্থা গোপন করিয়া ধনী কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। যাহা কিছু তাহার আছে, আর যাহা কিছু নাই সবই ইহাদের জানা।

এক গুচ্ছ চূর্ণালক স্থানচ্যুত হইয়া শ্যামলীর অবনত মুখের উপর দুলিতেছিল। হাত তুলিয়া তাহা যে সরাইয়া দিবে এমন শক্তিও তাহার যেন নাই। তপন অতি সন্তর্পণে কেশগুচ্ছ যথা স্থানে সরাইয়া দিল। তাহার আঙুলের স্পর্শে শ্যামলীর দেহ আনন্দে একবার শিহরিয়া উঠিয়াই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। পরম স্নেহে তাহার আরক্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তপন ধীরে ধীরে নিজের আসনে গিয়া বসিল।

তখনই তপনের মনে হইল, ঘরের হাওয়া কেমন যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন শ্লেষে ও পরিহাসে উভয়ের মধ্যে যে

লঘুতা বিরাজ করিত আজ আর তাহা নাই। তাহার নিজের মন আনন্দে মন্থর হইয়াছে, আর শ্যামলী তো মাথা তুলিতেই পারিতেছে না।

তপন জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া পরিহাস-লঘু কণ্ঠে কহিল,—যাক্‌ গে ও সব। আজকেও পড়াশুনো হবে, না হবে না? হিষ্টিটা খোলো।

শ্যামলী কিন্তু তথাপি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। হাতের কাছেই বইখানি খুলিয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। তখনও তাহার হাতের আঙুলগুলি কাঁপিতেছিল।

—ওখানি কি বই?

কোনো প্রকারে জড়িত কণ্ঠে শ্যামলী অস্ফুটস্বরে কহিল,—

—বাঃ! বেশ নতুন হিষ্ট্রি তো! দেখি?

তপন হাত বাড়াইয়াছিল, কিন্তু শ্যামলী তাড়াতাড়ি বইখানি তার দিকে ঠেলিয়া দিল,—পাছে আঙুলে আঙুল ঠেকিয়া যায়।

তপন বইখানি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া অবশেষে একটা জায়গা খুলিয়া শ্যামলীকে দিল।

কহিল,—এই জায়গাটা পড়। পলাশীর যুদ্ধের জায়গাটা।

শ্যামলী বইখানির এ-পাতা ও-পাতা চাহিয়া কোথাও পলাশীর নাম গন্ধ পাইল না। পরের পাতা উল্‌টাইতেই খেয়াল হইল, বইখানি ইতিহাস নয়, ল্যাম্ব্‌স্‌ টেল্‌স্‌ ফ্রম সেক্সপীয়ার। লজ্জায়

বইখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেই তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর শ্যামলী মুখ ঢাকিবার জন্য টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

তপন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হ'ল? বই নাও?

তেমনিভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়াই শ্যামলী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

—কেন?

—ভালো লাগছে না।

—পরীক্ষা দেবে কি ক'রে?

—দোব না।

একটু থামিয়া তপন হাসিয়া বলিল,—কিন্তু তারা না হয় পরীক্ষা না নিয়েই ছেড়ে দেবে। আমি তো দোব না। আমার মুখ বন্ধ করবে কি দিয়ে?

শ্যামলী বিলোল কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—সে আপনার কাছ থেকেই তখন শিখে নোব। এখন একটু চা খেয়ে মুখ বন্ধ করুন।

—আচ্ছা, তা না হয় করলাম। কিন্তু আমার আর একটি কথা শুনবে?

শ্যামলী চলিয়া যাইতেছিল, জিজ্ঞাসু নেত্রে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—আমাকে আর 'আপনি' বোলো না।

শ্যামলী কি একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—না, আজকে থাক।

শ্যামলী চলিয়া যাইতেছিল, তপন বলিল,—তোমারই সুবিধা হ'ত শ্যামলী। অভ্যেস হ'য়ে থাকত। সেদিন কিন্তু বারে বারে ভুল করবে।

পিছন ফিরিয়া চাহিয়া শ্যামলী বলিয়া গেল,—কি করব।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শ্যামলী ফিরিয়া আসিল। হাতে চা এবং খাবার। সেগুলি নামাইয়া রাখিতেই তপন হঠাৎ তাহার দু'খানি হাত চাপিয়া ধরিল। এক সেকেণ্ড · দুই সেকেণ্ড···

শ্যামলী তাড়াতাড়ি টান দিয়া বলিল,—আঃ! ছাড়ো! পল্টু রয়েছে।

তপন হাত ছাড়িয়া দিল। কহিল,—থাকলেই বা!

শ্যামলী কিন্তু সরিয়া গেল না। কাছেই টেবিলের উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রূকুটি করিয়া কহিল,—আহা!

তপন নিঃশব্দে আহারে মনোনিবেশ করিল।

একটুক্ষণ পরে শ্যামলী কহিল,—কেমন? মুখ বন্ধ হ'ল তো? এর পরে কিন্তু আর কোনো দিন পড়ার কথা নয়।

—যখনই দুষ্টুমি করবে, তখনই পড়ার কথা বলব।

—বললেই হ'ল!

চায়ে চুমুক দিয়া তপন বলিল,—জানো শ্যামলী, কালকে আমায় দেশে যেতে হচ্ছে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎই ঠিক করলাম। কাল থেকে বড়দিনের ছুটি আরম্ভ। ছুটির শেষেই আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে। এখন না গেলে শীগ্‌গির আর যেতে পারব না।

শ্যামলী খুব গম্ভীর হইয়া মুরুব্বির মতো কহিল,—সেই ভালো! অনেক দিন যাও নি, একবার যাওয়া উচিত।

তপন লক্ষ্য করিল, শ্যামলী তাহাকে 'তুমি' বলিতেছে। কিন্তু সে যেন কিছুই লক্ষ্য করে নাই এমনি ভাবে কথা কহিতে লাগিল।

কহিল,—এখন যাব না, এই ছিল কথা। হঠাৎ আমায় দেখে বাড়ীর সবাই অবাক হ'য়ে যাবেন।

শ্যামলী তপনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। কহিল,—ফিরতে কত দেরী হবে?

—তিন তারিখে আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে। ফিরব দোস্‌রা রাত্রে, কিম্বা সেইদিন সকালে। দূর তো বেশী নয়,—ট্রেনে ঘণ্টা চারেক লাগে।

শ্যামলী মাথা নীচু করিয়া টেবিলের উপর আঙুল দিয়া দাগ টানিতে টানিতে চুপি চুপি কহিল,—আমার সঙ্গে কবে দেখা করবে?

তপন হাসিয়া বলিল,—কবে কি,—বল কখন? পাঁচটায় আফিসের ছুটি, ছ'টার মধ্যে তোমার এখানে?

—ঠিক?

—ঠিক।

শ্যামলী চায়ের বাটি ও রেকাবী লইয়া বাহিরে যাইতেছিল। তপন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আচ্ছা, আমিও আজকে আসি। বুঝলে ?

শ্যামলী তাড়াতাড়ি বলিল,—এক মিনিট। আমি পাণ নিয়ে আসছি।

এক মিনিট তপন বসিয়া রহিল। শ্যামলী পাণের ডিবাটা তাহার সুমুখে রাখিয়া একেবারে কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—তোমার কি তাড়া আছে ?

—হ্যাঁ। কতকগুলো জিনিসপত্র কিনতে হবে। সকালেই গাড়ী কি না !

তপন ডিবা খুলিয়া একটা পাণ মুখে দিতে যাইতেছিল, শ্যামলী তাড়াতাড়ি ডিবাটা হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিল,—অমন ক'রে নয়। দেখি, হাঁ কর, আরো…আরো…হ'য়েছে।

একটা পাণ টুপ্ করিয়া তপনের মুখের মধ্যে ফেলিয়া গাল দুটি টিপিয়া দিয়া শ্যামলী চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেসে ফিরিয়া তপন দেখে, মস্ত একটা সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে,—কাছে যাহাদের বাড়ী তাহারা সন্ধ্যার গাড়ীতেই চলিয়া গিয়াছে,—যাহাদের দূরে তাহারা কাল সকালে যাইবে, আর কয়েকজনের নানা কারণে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না।

কেরাণীজীবনে ছুটি বলিতে এই ছুটিই,—পূজা আর বড়দিন। সেজন্য বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

—দেখ তো হে, কোটটা কেমন হ'ল। যা ভিড়!

—বেশ হয়েছে! কত নিলে? টাকা চারেক?

—কিছু বেশী। পাঁচ টাকা তিন আনা। ঠকা হয়েছে?

—না। ওই রকমই দাম। তবে রংটা এ রকম নিলে কেন? ছোট ছেলের জামা,—রঙের বাহার আর ক'দিন থাকবে? আমি তো ভেবে-চিন্তে এই রকম একটা নিলাম,—তিন টাকা ছ'আনা—দেখলাম ঠেসে-মেড়ে পরবে।

ওঘর হইতে কেহ কহিতেছে,—বাঃ! তোমার কপিগুলো বড় ভালো হয়েছে হে! আমি তো খুঁজে খুঁজে পেলাম না। কত নিলে?

—ও কি হে? কপি নিলে আর মটরশুঁটি নিলে না? বিলক্ষণ!

—আরে দেখ্, দেখ্, এ লোকটা কতকগুলো আলু কিনেছে দেখ্। তোদের দেশে আলুও পাওয়া যায় না, না কি?

—যাবে না আবার কেন? তবু যাচ্ছি যখন, কিছু নিয়েই বা গেলাম।

—ওরে, দেখি দেখি,—মেয়ের জন্যে কি রকম জামা কিন্লি দেখি! লুকুচ্ছিস কেন তাড়াতাড়ি?

—লুকুচ্ছি মানে? জামা কি কপালে ঝুলিয়ে বেড়াতে হবে না কি?

এমনি সময়ে তপন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঝাঁকায় কতকগুলা কপি, মটরশুঁটি ও কমলালেবু।

—আরে বাপ! তুমিও বাড়ী যাচ্ছ না কি তপনবাবু?

—কি রকম মনে হচ্ছে?

বলিয়া তপন আর দাঁড়াইল না, তেতালায় বিলাসের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

—বিলাস আছ না কি! এঃ! অন্ধকারে শুয়ে কেন হে! ওঠো, ওঠো খবর আছে।

বলিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিতেই বিলাস উঠিয়া বসিল।

—ঘুমুচ্ছিলে না কি? আছ ভালো! তার পর শোনো, আমার চাকরী হয়েছে শুনেছ? সেক্রেটারীয়েটে, একশো পঁচিশে আরম্ভ।

—তাই না কি?

হঁ্যা, আজ চিঠি এসেছে। তেস্‌রা থেকে 'জয়েন' করতে হবে। আর শোনো, গোটাপাঁচেক টাকা হবে তোমার কাছে? ভাবছি কাল বাড়ী যাব একবার। সবই কেনা হয়েছে। মনে হ'ল, ছোট ভাইটার জন্যে একটা গরম জামা কিনে নিয়ে গেলে হয়। বেচারার একটাও গরম জামা নেই, শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তা, আমার মাইনে পাওয়ার পরে নিয়ে গেলে তো শীত ফুরিয়ে যাবে। আছে তোমার কাছে টাকা?

বিলাস নিঃশব্দে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া একখানা পাঁচ টাকার

নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। এতক্ষণে তপনের নজর পড়িল তাহার মুখ যেন শুক্‌না দেখাইতেছে।

—ও কি হে, তোমার মুখ শুকনো লাগছে যে? অন্ধকারে চুপ ক'রে শুয়ে আছ, অসুখ করে নি তো?

বিলাস শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিল,—না, অসুখ করবে কেন?

—কিছু একটা হ'য়েছে নিশ্চয়। তুমি তো চুপ ক'রে শুয়ে থাকার ছেলে নও। কি ব্যাপার বল তো?

—ব্যাপার আবার কি? এমনিই শুয়ে আছি।

কিন্তু তপন অত সহজে ছাড়িল না। অবশেষে বিলাস বলিল, —মনটা ভালো নেই তাই।

—মন ভালো নেই? কেন?

—চাকরী আজ থেকেই শেষ হ'ল। ভাবছিলাম, আবার কোথায় ঘোরা-ঘুরি করব! মুস্কিল বটে।

তপনের সমস্ত আনন্দ যেন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার মতোও কোনো কথা সে খুঁজিয়া পাইল না। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বিলাসই তাহাকে ঠেলা দিয়া সচেতন করিল।

কহিল,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? জামা কিনতে হবে না?

তপন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হ্যাঁ, যাই।

টাকাটা পকেটে ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বিলাস আবার লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

১৬

মার্চ্চেণ্ট আফিসের কেরাণীদের বড়দিনে সরকারী আফিসের মতো বারো দিন ছুটি থাকে না। মুখুয্যে মহাশয়, অবিনাশবাবু এবং আরও অনেকে মঙ্গলবারেই ফিরিয়া আসিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ঘরে আসিয়া বসিতে না বসিতে উড়িয়া ভৃত্য সাশ্রুনেত্রে জানাইল,—এ মেসে আর থাকা চলিবে না।

মুখুয্যে মহাশয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব্যাপার?

ব্যাপার বড় সুবিধাজনক নয়, ওদিকের বড় বাড়ী হইতে সেদিন বহু লোক আসিয়া কেবল মারিতে বাকী রাখিয়াছে। বোধ হয় স্ত্রীলোকঘটিত কোনো ব্যাপার আছে।

মুখুয্যের আর হাতমুখ ধোয়া হইল না। তাড়াতাড়ি ডাকিলেন,—ওহে অবিনাশ, এদিকে এস।

অবিনাশ তখন পায়খানা যাওয়ার জন্য একখানি গামছা পরিধান করিতেছিলেন। ধীরভাবে কহিলেন,—যাই।

—যাই নয়, শীগ্‌গির এস। ব্যাপার গুরুতর।

গুরুতর ব্যাপারের কথা শুনিয়া অবিনাশ আর দেরী করিতে পারিলেন না। মুখুয্যের দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া বলিলেন,—কি আবার হ'ল?

মুখুয্যে তখন ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। কহিলেন,—এ মেসে আর একটি দিন নয়। শোনো এর কাছে ব্যাপারটা। কি ভয়ানক!

ভৃত্য বলিল,—ব্যাপারটা যে কি তাহা সেও ঠিক বলিতে পারে না। বিলাসবাবু বলিতে পারেন। সন্ধ্যার কিছু আগে সে কয়লা ভাঙ্গিয়া উনান ধরাইবার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় বহু লোক,—কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে ছোরা, কেহ বা এমনি শুধু হাতেই—হৈ হৈ করিতে করিতে মেসের দরজার গোড়ায় উপস্থিত হইল। এই মারে তো এই মারে। আর ভদ্রলোকের ছেলে যে সকল কথা মুখে আনিতে পারে না সেই সকল অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। বলিয়া ভৃত্য অবলীলাক্রমে সেই সকল অকথ্য এবং অশ্রাব্য কথার পুনরুক্তি করিল।

অবিনাশ ধমক দিলেন,—ও সব থাক। তার পর কি হ'ল বল্।

—তার পরে বিলাসবাবু এসে বহু কষ্টে তাদের থামান। কিন্তু তারা যে রকম চটেছে বাবু, রাতবিরিতে কার মাথায় যে লাঠি পড়ে কিছুই ঠিক নেই।

বিলাসকে ডাকা হইল। সে তো প্রথমে কথাটা চাপিয়া যাইতে চায়। শেষে বহু জেদে পড়িয়া ব্যাপারটা বিবৃত করে—

ভৃত্যের অনুমান মিথ্যা নয়। ব্যাপারটা স্ত্রীলোকঘটিত এবং গোলোকই তাহার নায়ক। কিন্তু এত দিনের মধ্যে যে একদিনও আত্মবিস্মৃত হয় নাই, সে যে কেন সেদিন অমন কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা যে দেবতা মানুষের মনে কাম দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহ বলিতে পারিবে না। মেসের বাড়ী কখনই খালি থাকে না। অন্যান্য ছুটির সময় সকলে বাড়ী যায় না, এবং বেশী দিন ছুটি

থাকিলে গোলোক নিজেও বাড়ী যায়। এবারে কি একটা কারণে তাহার যাওয়া ঘটিয়া ওঠে না। সেই হইল কাল।

গোলোক বলে, দোষ মেয়েটিরই। বহু দিন হইতেই সে নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মেসে সর্ব্বদা অনেক লোক থাকে বলিয়াই হউক, আর গোলোকের কাছ হইতে কোনো সাড়া আসে না বলিয়াই হউক এত দিন ব্যাপার বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। ঘটনার দিন মেসের অধিকাংশ জানালা বন্ধ ছিল। যে দুই একটা জানালা খোলা ছিল সেখানেও লোকজন নাই দেখিয়া মেয়েটির সাহস বাড়িয়া গেল। ভিজা কাপড়ে যখন সে ঘরে ঢোকে স্পষ্ট লক্ষ্য করে গোলোক তাহার বিছানায় শুইয়া আছে। কিন্তু সে যেন তাহা লক্ষ্যই করে নাই এমন ভাবে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। অনাবৃত উর্দ্ধাঙ্গে যখন বডিস্ পরিতেছে সেই মুহূর্ত্তে সে যেন প্রথম গোলোককে লক্ষ্য করিল এমন ভাব দেখাইয়া তাড়াতাড়ি লজ্জিতভাবে অন্তরালে সরিয়া গেল। কিন্তু একটু পরেই জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া গোলোকের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

অতঃপর গোলোকের পক্ষে আত্মসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল। সেও উঠিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিল এবং হাত ইসারায় মেয়েটিকে ডাকিল। মেয়েটি হাসিয়া একটি ছোট কিল উঁচু করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর গোলোক শুইয়া আছে এমন সময় মেয়েটি আবার আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। গোলোক তখন পাশ ফিরিয়া শুইয়া একখানি বই পড়িতেছিল। সেখানি

বন্ধ করিয়া সেও উঠিয়া বসিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে গোলোক আবার শুইতে যাইবে এমন সময় আবার জানালা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। গোলোকের আর শোয়া হইল না। এই রহস্যময়ীর দিকে চাহিয়া সে অনেকটা বোকার মতো হাসিতে লাগিল।

এবারে আর মেয়েটি সরিয়া গেল না। বডিসের ভিতর হইতে একটি ছোট চিঠি বাহির করিয়া ইসারায় তাহাকে রাস্তার দিকে আসিতে বলিল। সে ইঙ্গিত গোলোক বুঝিল। ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, তবু অসম্মতি জানাইবার মতো শক্তিও ছিল না। যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই কোমরে কাপড় জড়াইয়া গোলোক বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটির বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দূর হইতেই গোলোক দেখিল রাস্তার ধারের বারান্দার রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া মেয়েটি তাহার আসা দেখিতেছে,—চোখে চোখ পড়িতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

গলি রাস্তা হইলেও একেবারে জনবিরল নয়। কয়েকটা উড়িয়া ঠাকুর কাজ শেষ করিয়া গল্প করিতে করিতে ফিরিতেছে। একজন ফেরিওয়ালা কাঁসার থালা বাজাইয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিতে চাহিতে পথ চলিয়াছে। কিন্তু মেয়েটির কি অসীম সাহস! তাহাদের গ্রাহ্যও করিল না। গোলোক কাছে আসিতেই তাহার পায়ের গোড়ায় টুপ্ করিয়া কি একটা ফেলিয়া দিল। সেটা হাতে করিয়া কুড়াইয়া

লয় এমন সাহস গোলোকের ছিল না। অথচ ফেলিয়াও চলিয়া যাইতে পারে না, এখনই আর কাহারও হাতে গিয়া পড়িবে। একবার যেন কি পড়িল ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সোজা চলিয়া গেল। কিন্তু তখনই ফিরিয়া আসিয়া জুতার একটা টক্কর দিতেই চিঠিখানা ও-মোড়ে গিয়া পৌঁছিল। গোলোক চিঠিটা কুড়াইয়া লইতেই মনে হইল রাস্তার সমস্ত লোক যেন সকৌতুকে তাহার কাণ্ড দেখিতেছে। তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। সেখানে আর তিলার্দ্ধ না দাড়াইয়া এক প্রকার ছুটিতে ছুটিতে মেসে আসিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

চিঠি দেওয়ার কৌশল আছে। প্রথমে একটি ছোট ঢিলের উপর চিঠিখানি জড়ানো হইয়াছে। তাহার উপর একটি ছোট ন্যাকড়া দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা। ন্যাকড়া ও ঢিলটা ফেলিয়া দিয়া চিঠিখানা খুলিতেই নজরে পড়িল, মেয়েটি খাটের উপর একটা পাশ বালিশ জড়াইয়া শুইয়া তাহার দিকে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে।

চিঠি নয়, পরিচিত কোনো কবির কয়েক লাইন কবিতা—

ও-পারে থাকে চক্রবাক, এ-পারে চক্রবাকী। নিস্তব্ধ রাত্রে নদীর কালো জল দুজনের মধ্য দিয়া কুলুকুলু বহিয়া চলে। সমস্ত রাত একে অপরকে ডাকিয়া মরে। এই গোপন কথা আর কেহ জানে না। রাত্রি শেষে শুধু দেখা যায় বালুচরে দুজনের পালক পড়িয়া আছে।

এই কয় লাইন কবিতা। আর কিছু নাই। এ-পিঠে ও-পিঠে

কোথাও কাহারও নাম নাই,—শুধু এইটুকু কবিতা সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা।

গোলোক চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল ও-জানালায় মেয়েটি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিঠির উত্তর চায়। গোলোক হাসিয়া চিঠির উত্তর লিখিতে বসিতেছিল, হঠাৎ কি যেন একটা হইয়া গেল ঠিক বুঝিতে পারিল না,—মেয়েটি শশব্যস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

তার পরে চিঠি লেখা শেষ করিয়া গোলোক যখন চিঠিখানি কি করিয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় তাহার হদিস পাইবার জন্য আবার জানালা খোলার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখনই এই কাণ্ড!

সমস্ত শুনিয়া মুখুয্যে বলিলেন,—আর নয় ভাই, যথেষ্ট হ'য়েছে। এখন বেঘোরে প্রাণটা হারাতে না চাও তো আর একটি দিনও দেরী করা নয়।

অবিনাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—এ আমি আগেই জানতাম।

মুখুয্যে গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া বলিলেন,—আজ সন্ধ্যে থেকেই মেস দেখতে আরম্ভ করা যাক্। ও-সব ছেলে-ছোকরায় কাজ নেই। নিতান্ত অনুগত যে ক'জন, শুধু তাদেরই নেওয়া হবে। ছোট্ট একটি মেস দেখে নিরিবিলি বাকী ক'টা দিন কাটাতে হবে। ছেলে-ছোকরার কাছ থেকে যথেষ্ট শিক্ষা হ'ল। বাবাঃ!

অবিনাশ গেলেন পায়খানায়, আর মুখুয্যে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য নীচে চলিয়া গেলেন।

তপন যখন ফিরিল তখন নূতন মেস দেখা হইয়া গিয়াছে, কেবল উঠিয়া গেলেই হয়। কিন্তু গোলোককে আর পাওয়া যাইতেছে না। মুখুয্যেরা আসিবার আগের রাত্রেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার কোনো সংবাদ নাই। কলিকাতাতেই আছে নিশ্চয়। চাকুরী ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে? তাহার আফিসে গেলে সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অত কষ্ট করিয়া সংবাদ লইতে গেলে পাছে, আবার সে কিছু সন্দেহ করিয়া বসে সেই ভয়ে কেহ সংবাদ লইতেও সাহস করিতেছে না।

তপন ফিরিল সকাল আটটার গাড়ীতে। দশটায় আফিস। তাহার আর গল্প করিবারও সময় ছিল না। কোনো রকমে স্নান সারিয়া নাকে মুখে দুই মুঠা দিয়া জামা কাপড় পরিতেই ন'টা বত্রিশ। ন'টা বত্রিশে না বাহির হইলে ঠিক সময়ে আফিসে পৌছানো যায় না।

আফিসে গিয়া বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করিতেই তিনি তপনকে তাহার জায়গা দেখাইয়া দিলেন। সে দিনটা তপনের কাজ বুঝিয়া লইতে এবং নূতন নূতন বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেই কাটিয়া গেল। মধ্যে ছোটদা একবার আসিয়া সংবাদ লইয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া পাঁচটা বাজিতেই তপন উঠিয়া পড়িল। সেইখানেই কলে একবার মুখটা ধুইয়া লইয়া শ্যামলীদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। সেই রকমই কথা আছে।

শ্যামলীর পড়িবার ঘরটা খালি। বাহিরেও কেহ নাই। তপন

উপরে একটা সংবাদ পাঠাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকিয়া চাহিয়াই মুখ নামাইয়া লইল,—শ্যামলী নয়, পল্‌টু।

পল্‌টু ধীরে ধীরে মাষ্টার মহাশয়ের চেয়ারের কাছে আগাইয়া আসিল। একটু দ্বিধা করিয়া ডাকিল,—মাষ্টার মশায়!

—আজ্ঞে।

—দিদি আর পড়বে না। মা ব'লেছে, দিদির বিয়ের কথা হচ্ছে। খুব মস্ত বড়লোক তারা। মা বললে, আপনার সঙ্গে দিদির কিছুতে বিয়ে হ'তে পারে না। আপনি আর আমাদের বাড়ী আসবেন না।

ছেলেটা বলে কি! তপন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে। এখন তোমার দিদিকে একবার খবর দাও দেখি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটুখানি শাড়ীর প্রান্ত দ্বারের অন্তরালে দুলিতেছিল। তপনের তাহা নজরে পড়ে নাই। এখন সে মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে আসিলেন।

তপন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্যামলীর মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

শ্যামলীর মা আশীর্ব্বাদ করিয়া মধুর হাস্যে কহিলেন,—পল্‌টু ঠিকই বলেছে, বাবা। বাবুবাজারের মুখুয্যেদের বাড়ীতে শ্যামলীর বিয়ের সবই ঠিক হ'য়ে গেল কি না। নেবেও কম নয়, পনেরো হাজার টাকা তো ওদেরই গুণে দিতে হবে। তা ছাড়া আরও

তো কত খরচই আছে। ওদের সঙ্গে আবার আমাদের অন্য সম্পর্কও আছে কি না! আমার ভাইই এ সম্বন্ধ করলে। তা একটু তাড়াতাড়ি হবে। ফাল্গুনের পনেরোই বিয়ে। তারা না হয় বড়লোক,—লোকজন অনেক আছে। আমাদের তো এই কুঁড়েটুকু! দেড়হাজার তো বরযাত্রীই আসবে। উনি বলছিলেন, সামনের ওই বড় বাড়ীটা সেই ক'দিনের জন্যে নিতে হবে। তুমি তো সবই জানো বাবা, লোকজন আমাদের নেই। উনি তো ওই মানুষ,—আপিস আর বাড়ী, এ ছাড়া কিছু চেনেন না। তোমাকে বাবা একটু খাটা-খাটুনি করতে হবে। আমরা তোমাকে ছেলের মতো দেখি। উনি তো স্পষ্টই বলেন, আগে আমার তপন তার পরে পল্টু। নইলে এ বাজারে অমন চাকরী কেউ করে দেয়?

এ ঘরের হাওয়ায় তপনের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। এই কয় দিনের মধ্যে যে এমন একটা ওলট-পালট হইতে পারে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। শ্যামলীর মায়ের কথায় সে কেমন আচ্ছন্নের মতো হইয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত দেহ টলিতেছিল। ভয় হইতেছিল এখনি বুঝি পড়িয়া যাইবে।

কোনো রকমে স্খলিত কণ্ঠে শুধু বলিল,—সে তো নিশ্চয়।

শ্যামলীর মা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তপন আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

বলিল,—আচ্ছা, আজকে আমি আসি।

বলিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু শ্যামলীর মায়েরই বা দোষ কি?

তপন রূপবান এবং শিক্ষিত। সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহে একটা ভালো চাকুরীও হইয়াছে সত্য। কিন্তু আজ যদি তাহার একটা ভালো-মন্দ ঘটে মেয়েটি তো একেবারে পথে বসিবে। এমন অবস্থায় কোন্ মা তাহার হাতে মেয়ে সম্প্রদান করিতে পারে?

বাইশে ডিসেম্বর তপনের চাকুরী স্থির হয়। সেই রাত্রেই সুরেন্দ্রবাবু জেদ ধরিয়া বসেন, আগামী ফাল্গুনেই তাহার সঙ্গে শ্যামলীর বিবাহ পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। আর অপেক্ষা করা কাজের কথা নয়। কিন্তু শোয়ার সময় স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়িতেই তিনি বারুদের মতো ফাটিয়া পড়িলেন। এত দিন পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রবাবু নিজেও এই বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই স্থির নিশ্চয় করিয়া উঠেন নাই। তপনের জন্য সাহেবকে তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, সাহেবও অনেকটা কথাই দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উপরও নির্ভর করা চলে না। সাহেবকে অমন কত লোকই ধরিয়াছে,—কত বড় বড় লোক। তাহার মধ্যে কাহার যে হইবে সে কথা মোটেই নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। সেজন্য সুরেন্দ্রবাবুও মনঃস্থির করিতে পারেন নাই, তাঁহার স্ত্রীও যথেষ্ট প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। আগে চাকুরীই তো হউক।

কিন্তু চাকুরী হওয়ার পর সুরেন্দ্রবাবুও যেই জেদ ধরিলেন, তাঁহার স্ত্রীও অমনি ক্রোধে অন্ধকার দেখিলেন। স্বামীকে তিনি ভালো করিয়াই চেনেন, গত কুড়ি বৎসর যাবৎ তাঁহার নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া আসিতেছেন। বেশ জানেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই

ইচ্ছার জয় হয়। তাই গোপনে তিনি ভাইকে দিয়া, বাবুগঞ্জের মুখুয্যে বাড়ীতে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন। মুখুয্যেরা বিশ হাজার হাঁকিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। বড় ঘর না হইলে অত টাকা কেহ হাঁকিতে পারে? কিন্তু অত টাকা দেওয়ার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তিনি দশ হাজার দিতে পারেন বলিয়া পাঠান। সেই দর কষাকষির এত দিনে অবসান হইয়াছে। তাঁহার ভাই অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া পনেরো হাজার টাকায় রাজি করাইয়াছেন। শীঘ্রই তাঁহারা মেয়ে দেখিতে আসিবেন। দেখা আর কি, টাকার কথা যখন পাকা হইয়া গিয়াছে, তখন আর দেখিবার প্রয়োজন নাই। একেবারে আশীর্ব্বাদ করিতেই অসিবেন।

এত কাণ্ডের পরে সুরেন্দ্রবাবু বলেন কি না, আগামী ফাল্গুনে, তপনের সঙ্গে বিবাহ পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে?

গৃহিণী ঝাঁজের সঙ্গে বলিলেন,—তোমার কি বাহাত্তুরে ধরেছে? এখনও তপনের সঙ্গে বিয়ের কথাটা মনে মনে ঘুষছ?

সুরেন্দ্রবাবুও রাগিয়া বলিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাতে দোষটা হয়েছে কি?

—তপনের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে কি? লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে? টাকা বাঁচাতে চাও? তোমার টাকা খাবে কে?

সুরেন্দ্রবাবু যে টাকা বাঁচাইবার জন্য তপনের হাতে সম্প্রদান করিতে চাহেন এ কথা একবারও ভাবেন নাই। টাকা বাঁচাইবার

লোকও তিনি নহেন। তথাপি এই আকস্মিক আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠিলেন।

কহিলেন,—টাকা বাঁচাতে চাই? তোমার যে মুখে যা আসছে তাই বলছ!

—বলব না? আমি কেন, যে শুনবে সেই এ কথা বলবে। নইলে ওই মড়ুইপোড়া বামুনের ছেলের আছে কি যে তার হাতে মেয়ে দেবে?

—সব আছে, কারণ ওর পেটে বিদ্যে আছে। ফাষ্ট বুক পর্য্যন্ত তো তোমার বিদ্যে, তুমি ওর মর্ম্ম বুঝবে কি ক'রে?

—বুঝেও কাজ নেই। ফাটা পা নিয়ে খালিগায়ে আসবে বেয়াই, আর দু'গাছা শাঁখা প'রে আসবে বেয়ান, সে আমি কিছুতে হ'তে দোব না।

সুরেন্দ্র রাগিয়া কহিলেন,—তা দেবে কেন? বড় লোকের গোঁয়ার-গোবিন্দ বকাটে ছেলের হাতে পড়ে মেয়ের দুর্দ্দশার একশেষ না হ'লে তো তোমার সুখ হবে না।

রাগে গৃহিণী বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন,—দেখ, ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না বলছি। বড়লোকের সব ছেলেই গোঁয়ার-গোবিন্দ হয় কি না, আর সবাই বৌএর দুর্দ্দশার একশেষ করে! বড়লোকের ছেলে তুমি ক'টা দেখেছ শুনি? এই তো আমার ভায়েরাও রয়েছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, বলতে নেই, মা-লক্ষ্মীর অকৃপাও নেই। তারা সব বৌকে ধরে মারছে, না? বৌকে তারা খেতেও দেয় না?

গৃহিণীর ভায়েদের কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—তোমার ভায়েদের কথা বোলো না। বরং অন্য কথা বল।

স্বামীর হাসি দেখিয়া গৃহিণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—কেন, তাদের দোষটা কি?

গৃহিণীর রাগ সপ্তমে চড়িতে দেখিয়া সুরেন্দ্রবাবু ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার আবার ফিটের রোগ আছে। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল, এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপিয়া যান।

কিন্তু গৃহিণী আবার একটা ঠেলা দিয়া কহিলেন,—কি দোষ শুনি?

সুরেন্দ্রবাবুকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল,—না, দোষের কথা নয়। তবে ওই স্বভাব চরিত্রটা তো তাঁদের বিশেষ···

—হাতে টাকা থাকলে কোন্ ব্যাটাছেলের আবার স্বভাব-চরিত্র ভালো থাকে? তাই ব'লে তাদের হাতে মেয়ে দোব না?

—না, দোব না কেন? নাচারে পড়লে তাও দিতে হয়। তবে কি জান···

—নাচার আবার কি? বাবুগঞ্জের মুখুয্যেবাড়ীর এঁটো পাতা কুড়োতে পেলেও তোমার মেয়ে ভাগ্য ব'লে মানবে।

—আমার মেয়ে কিসে ভাগ্য মানে জানি না। কিন্তু আমি চাই না সে বাবুগঞ্জের মুখুয্যেবাড়ীতে এঁটো পাতা কুড়ুক। তার চেয়ে গরীবের ঘরের ঘরণী হওয়া অনেক ভালো।

গৃহিণী এক মুহূর্ত্ত থামিয়া গেলেন। তার পর বলিলেন,—

দেখ, বাবুগঞ্জের মুখুয্যেদের সঙ্গে সমস্ত কথা, মায় দেনা-পাওনা পর্য্যন্ত সব ঠিক হ'য়ে গেছে। এর পরে তুমি সে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে আমার আর আমার ভাইদের মুখ হাসাতে চাও হাসিও। কিন্তু যেখানেই সম্বন্ধ কর, জামাই যদি বাড়ীর গাড়ীতে চ'ড়ে আমার বাড়ীতে না নামে, আমি দেশান্তরী হব, কিম্বা গলায় দড়ি দেব—তা ব'লে রাখছি।

বলিয়া হুম্ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

খবরটা শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবু শিহরিয়া উঠিলেন।

সভয়ে, সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি বিয়ের সম্বন্ধ এরই মধ্যে পাকা ক'রে ফেলেছ না কি?

—হাঁ। আসছে সোমবারে আশীর্ব্বাদ করতে আসবে।

—সেই···সেই··· মাতাল ছেলেটার সঙ্গে?

—মাতাল আবার কি? বয়সকালে অমন সবারই একটু-আধটু হয়।

গৃহিণী এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুরেন্দ্রবাবু অস্ফুটস্বরে একবার 'হুঁ' বলিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

আশাভঙ্গের একটা মস্ত বড় দুঃখ আছেই। কিন্তু তপন নিজের অবস্থার সঙ্গে সুরেন্দ্রবাবুর অবস্থার যতই তুলনা করে, ততই তাহার মনে হয়, সুরেন্দ্রবাবুদের ব্যবহারে সে যত ক্ষুব্ধ হইয়াছে ততটা ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো কিছু নাই। বিশেষ, সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিলে তাহার ক্ষোভ আরও কমিয়া যায়। ভদ্রলোক তাহাকে দেখিলে চোরের মতো সরিয়া পড়েন। নিতান্ত সামনে পড়িয়া গেলে কি যে বলিবেন ভাবিয়া পান না। বড় ভালো লোক। তাহার চাকুরীর জন্যও কম শ্রম স্বীকার করেন নাই।

তপন ভিতরের কথা জানে না। কাহার আপত্তিতে যে এ বিবাহ ভাঙিয়া গেল সে সংবাদ তাহার অজ্ঞাত। তবে শ্যামলীর মায়ের সস্নেহ বচন তাহার ভালো লাগে নাই। তথাপি সে ইহাদের প্রাণপণে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। তাহার পক্ষে মস্ত বড় সান্ত্বনার কথা এই যে, শ্যামলী তাহাকে ভালোবাসিয়াছে,—সে নিরপরাধ,—এবং এই মুহূর্তে তাহারই মতো কষ্ট পাইতেছে।

তপন প্রাণপণে ইহাদের ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। তবু মন যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। কিছু ভালো লাগে না,—কিছুতে মন দিতে পারে না।

সেদিন রবিবার। মেসে হট্টগোল চলিতেছে। কাল মেস বদল করা হইবে। তপনের এই হট্টগোল ভালো লাগিতেছিল না।

ভাবিল একবার ছোটদাদার বাড়ীটা ঘুরিয়া আসা যাক। ইহার মধ্যে আর একদিনও ওদিকে যাওয়া হয় নাই। অথচ যাওয়া খুবই উচিত ছিল,—বিশেষ চাকুরীটা হওয়ার পর। তপন আলোয়ানটা গায়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখন ছোটদাদার বাড়ীতে শ্যামলী ও বৌদিদিতে এই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল।

শ্যামলীর দুঃখ এই একটি মেয়েই বোঝে। তাহার সঙ্গে বৌদিদির পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল। শ্যামলীকে সে চিনিয়াছে। বুঝিয়াছে, নিঃসঙ্গ গৃহকোণে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া মেয়েটি হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। তাহার কাছে দুদণ্ড মনের কথা কহিয়া তবু খানিকটা সান্ত্বনা পাইবে।

রবিবারে সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া বৌদিদি শ্যামলীদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। একথা সেকথার পর অবশেষে শ্যামলীর মাকে কহিল,—শ্যামলীকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি মা। সন্ধ্যের আগেই পাঠিয়ে দোব।

শ্যামলীর মা একগাল হাসিয়া বলিলেন,—তোমার বাড়ী নিয়ে যাবে সে কি আর জিগ্যেস করতে হবে মা, না অনুমতি নিতে হবে? কিন্তু আজ বাদে কাল বিয়ে হবে। তারা তো আর আমাদের মতো গেরস্থ নয় মা, রাজা বললেই হয়। এখন কি আর পাড়া-বেড়ানো চলে?

বৌদিদিও কম পাত্র নয়। সেও একগাল হাসিয়া শ্যামলীকে

বুকে জড়াইয়া কহিল,—শ্যামলী বুঝি রাজরাণী হ'লে আর আমাদের সঙ্গে কথা কইবে। না, আমাদের বাড়ী যাবে? সেই জন্যেই তো আজকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি মা। আজও জোর আছে তাই এসেছি।

এ কথার পরে আনন্দে ও গর্ব্বে শ্যামলীর মা গলিয়া গেলেন। কহিলেন,—সে কি কথা, বৌমা, আছেই তো তোমাদের জোর। তোমার বাড়ী যাবে, তুমি নিজে নিতে এসেছ,—তার ওপর কি 'না' বলতে পারি? তা, সন্ধ্যের আগে যেন পাঠিয়ে' দিও বৌমা। নইলে উনি আর রক্ষে রাখবেন না।

বৌদিদি শ্যামলীকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল,—তাহ'লে যাও ভাই, শীগগির কাপড়টা ছেড়ে এস। দেরী কোরো না।

মায়ের ন্যাকামিতে শ্যামলীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে! কহিল,—চলুন।

বৌদিদি হাসিয়া কহিল,—কাপড়টা ছেড়ে এস।

আপনার অত্যন্ত সাধারণ পরিধেয় বস্ত্রের দিকে শ্যামলী একবার চাহিল। তার পর বৌদিদিকে একটা ঠেলা দিয়া কহিল,—তা হোক। আপনারা তো আর বাবুগঞ্জের মুখুয্যেরা নন বৌদি, আপনাদের বাড়ীতে এই পোষাকেই চলবে।

বলিয়া খোঁচাটা কতখানি মাকে আঘাত দিল তাহা দেখিবার জন্য না দাঁড়াইয়াই বৌদিদির আগে-আগে নীচে নামিতে লাগিল।

মেয়েব খোঁচা খাইয়া শ্যামলীর মা এক পলকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই হাসিয়া বৌদিদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—শোনো মেয়ের কথা! সবাই বুঝি বাবুগঞ্জের মুখুয্যেদের মতো বড় লোক হয়!

যে কথা প্রাণান্তেও শ্যামলী কাহাকেও বলে নাই, এই স্নেহপরায়ণা মেয়েটি পাশে বসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেই তাহা প্রকাশ হইয়া গেল। শ্যামলী তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বৌদিদি তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া, মুখে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, অমন ভাঙিয়া পড়িলে তো চলিবে না। মেয়েমানুষের জীবনে এমন ছোট-খাটো ব্যাপার কিছুই নয়। প্রথম প্রথম মনে হয় বটে, এত বড় দুঃখ ওইটুকু নরম বুকে সহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সবই সহ্য হইয়া যায়। যাহাকে একদিন না দেখিলে মৃত্যুকামনা করে, তাহাকে আর মনেও পড়ে না। এই নিয়ম।

—আপনিও সেই কথা বলছেন বৌদি?

—সবাই সেই কথা বলবে ভাই। বিয়ের আগে কোন্ মেয়ের জীবনে এমন একটা-আধটা ঘটনা না ঘটে! তাই ব'লে তাই কি কেউ মনে রাখে, না মনে থাকে? আমারও আজ কম দুঃখ হবার কথা নয় ভাই। আমার এক দিকে তুমি, আর এক দিকে

ঠাকুরপো। তবু মনে হয়, তোমার বাপ-মা যেখানে বিয়ের ঠিক করেছেন, সেই তোমার সত্যিকার স্থান।

অকস্মাৎ শ্যামলী মাথা তুলিয়া চাহিল। আহত ফণিনীর মতো দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিল,—কেন? তাদের অনেক টাকা আছে তাই?

বৌদি হাসিয়া কহিল,—তাই। টাকা কি সোজা জিনিস ভাই?

শ্যামলীর মুখ-চোখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—ছিঃ! ছিঃ! আপনিও—

বৌদি কিন্তু তথাপি হাসিতে লাগিল। বলিল,—সত্যি কথা বলব না?

—না, সত্যি কথা নয়। আমি ছেলেমানুষ, টাকার মহিমা হয় তো বুঝি না। কিন্তু আপনিও তো আমার চেয়ে বেশী বড় নন। আপনি শুধু আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

বৌদি এই আক্রমণে ভড়কাইয়া গেল। হঠাৎ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শ্যামলী বলিতে লাগিল,—টাকা ওদের কত আছে জানি না। শুনি তো অনেক আছে। কিন্তু সে টাকা আমার কোনো কাজেই লাগবে না। শুধু কোনো দিন যদি ডুবে মরতে হয়, সেই টাকার থলি গলায় বেঁধে মরা চলবে। আর কিছু নয়।

এবারে বৌদি হাসিয়া কহিল,—এই কথা আজকে ব'লে যাচ্ছ, আবার কিছুদিন পরেও জিগ্যেস করব। সেদিন কিন্তু তুমিই এর উল্‌টো কথা বলবে।

—কক্ষনো না।

ঠিক এমন সময় নীচে তপনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে স্বর শুনিয়া শ্যামলী যেন চকিত হইয়া উঠিল। বৌদি ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইল।

—এস, ঠাকুরপো।

এ যেন অন্য লোকের কণ্ঠস্বর! রহস্যপ্রিয়া কলহাস্যময়ী বৌদিদির নয়।

—তুমি একটু ওঘরে বসবে ঠাকুরপো? আমি এক্ষুনি আসছি।

তপন দেখিল, ঘরের মধ্যে শোফায় শ্যামলী নতমুখে বসিয়া আছে। এই কয়দিনেই তাহার তনু দেহলতা ক্ষীণ হইয়াছে। তপনের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামলীকে যে তাহার অনেক কথা বলিবার আছে। অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এ জীবনে হয় তো আর এমন সুযোগ মিলিবে না।

তপন সকাতরে কহিল,—এই ঘরেই একটু বসি না, বৌদি। আমি বেশীক্ষণ বসব না।

দরজার একটি কপাটে ঠেস দিয়া বৌদি যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—না, তুমি ও ঘরেই বোস গে।

বৌদির এই আদেশের বিরুদ্ধে আর একটি কথাও কহিতে না পারিয়া তপন নীরবে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বৌদি ফিরিয়া আসিয়া শ্যামলীর পাশে বসিল।

কহিল,—ভালোবাসা কি অতই সোজা ভাব শ্যামলী, যে একটি মনের মতো পুরুষ পেলেই হ'য়ে গেল? ঘর চাই না? বাড়ী চাই না? ছেলে চাই না? তবে ভালোবাসা স্থিতি লাভ করবে কোথায়? তুমি কি ভেবেছ ঠাকুরপোকে ভুলতে তোমার বেশী দিন লাগবে? মোটেই না। এর পরে যদি কখনও নানা কাজের ফাঁকে মনে পড়ে সে দিন মনে-মনে লজ্জাই পাবে,—ভাববে, কি ছেলেমানুষীই একদিন ক'রেছিলে!

তপনের আগমনের পর হইতেই শ্যামলী আর কথা কহিতেছিল না। কিন্তু সে যে বৌদির কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করিতেছিল না তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যাইতেছিল।

বৌদি জোরে জোরেই কহিতে লাগিল, তারও পরে যদি কোন দিন তোমাদের দেখা হয়,—মনে করো কোনো ট্রেণের কামরায়,—তুমি অসঙ্কোচে তাকে সুমুখে বসিয়ে টিফিন কেরিয়াব থেকে খাবার বের ক'রে খাওয়াবে। তুমি দুঃখ করবে, তোমার ছেলেটার শরীর কিছুতে সারছে না। কত জায়গায় কত চেঞ্জে যাওয়া হ'ল কিছুতে কিচ্ছু না। আর সে দুঃখ করবে তার বাতের অসুখটা কিছুদিন থেকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনো কথাই কেউ খুঁজে পাবে না।

বলিয়া বৌদি আপন মনেই কি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কহিল,—তোমাদের আজকের ভালবাসার মূল্য আছে না কি?

একলা ঘরে বসিয়া তপন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ, বৌদির শেষের কথাগুলা সবই তাহার কানে যাইতেছিল। বৌদির

ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিল,—আচ্ছা, আজকে আমি উঠ্‌লাম। অন্য একদিন আসব। ছোটদাকে বলবেন।

—সে কি? চা খেয়ে যাবে না?

—আজ থাক বৌদি।

হঠাৎ শ্যামলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—শোনো। একটু দাঁড়াও।

তপন পা বাড়াইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামলী আস্তে আস্তে তাহার পায়ের কাছে একটি প্রণাম করিয়া দ্বারের অন্তরালে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। এই ব্যাপার এতই আকস্মিক যে তপন তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া শুধু অনুভব করিল, অবরুদ্ধ কান্নায় তাহার দেহলতা বুঝি ভাঙিয়া পড়িতেছে।

বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তপন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

১৮

মেসে ফিরিয়া তপন দেখিল দরজার সুমুখেই একটা দাঁড়াইয়া আছে। ছেলেরা তাহার উপর নিজের নিজের জি বোঝাই করিতেছে। রাত্রে আর রান্না হইবে না। ঠাকুর-চাক মেসে উনানপাত্তা ও ঘর পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত। কুয়ে বাবু সেখানে ইতিমধ্যেই চলিয়া গিয়া সেখানকার কাজ করিতে

তপনকে দেখিয়াই সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল।

—এই যে বাবু মশায়, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? নতুন মেসে যেতে হবে না?

—এই যে যাই।

জিনিসপত্র বলিতে তপনের বিশেষ কিছুই ছিল না। চৌকিটা উহারা আগে হইতেই চাকরের সাহায্যে নামাইয়া গাড়ীতে বোঝাই করিয়াছে। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু একটা বাক্স আর বিছানা। একটা একটা করিয়া নিজেই সেগুলা বহিয়া আনিয়া তপন গাড়ীতে বোঝাই করিল।

গাড়ীটা লোকেরা টানিয়া লইয়া চলিল। বাবুরা গল্প করিতে করিতে পাশে পাশে চলিল।

তখনও যায় নাই কেবল মুখুয্যে ও অবিনাশ।

বাড়ীটা একেবারে খালি। ঘরে লোক নাই, জিনিসপত্র কিছু নাই। শুধু দেওয়ালে কতকগুলি পেরেক এখনও পোঁতা আছে। ও ঘরে বন্ধুর পিতৃবিয়োগের সময় একদিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া গোটা

ঘরের দরজার স া হবিষ্যান্ন রাঁধা হইয়াছিল। দেওয়ালে কালি আজকে আমি ়ও আছে।

বলবেন। একটা ঘরে গোটা দুই ইট পড়িয়া আছে। তাহার —সে ়লি বসানো থাকিত। লইয়া যায় নাই কেন কে .— ়য়ে তো দরকার হইবে না।

হ ়টা যে এত জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা আর কখনও দাঁড়া ়ও চোখে পড়ে নাই। অথচ এই বাড়ীতেই কতকাল তাহারা টাইয়া দিল। কি করিয়া কাটাইল ভাবিতে বিস্ময় লাগে।

মুখুয্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—মেসটা এতদিনে তাহ'লে ভাঙল! কি বল অবিনাশ?

অবিনাশ জবাব দিল না। বাহিরের খোলা মাঠের দিকে যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

এই মেসে তাহারা যে কবে ়াসিয়াছে আর ভালো করিয়া মনেও পড়ে না। ়খন তাহারা নিতান্ত ছেলেমানুষ,—সবে চাকুরীতে ঢুকিয়াছে।

—চল অবিনাশ, আর কেন?

—হ্যাঁ চল।

সিঁড়ির মুখেই কে একটা জুতার খালি বাক্স ফেলিয়া গিয়াছে। বাক্সটা একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মুখুয্যের তামাক টিকা রাখিবার কাজে লাগিতে পারে।

চলিতে চলিতে মুখুয্যে সেটাকে কুড়াইয়া লইলেন।

শেষ